প্রথম বর্ষ  প্রথম সংখ্যা

# কিশোরমনা

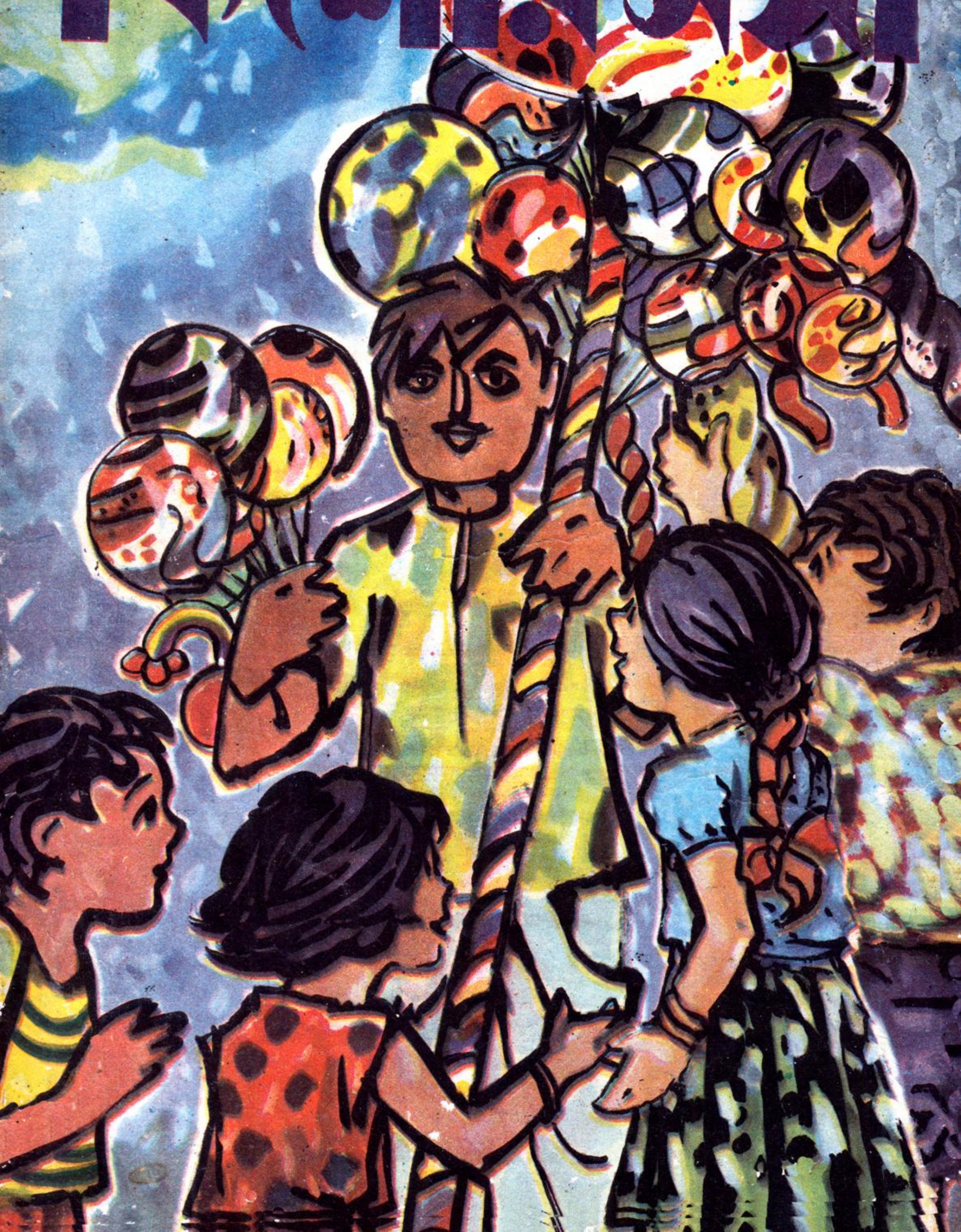

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ডু

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ডু

## একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com

এলবা
ওয়াশিং পাউডার
NEW
Washing Powder
Elba
ELBA LABORATORIES CAL-73
ময়লা পরিষ্কারের সেরা হাতিয়ার
EL
এলবা লেবোরেটরিজ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

# কিশোরসঙ্গী

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী উনিশশো পঁচাশি
দাম : তিন টাকা

সম্পাদক:
সঞ্জয় বক্সী
সংযুক্ত সম্পাদক :
হান্নান আহসান
চৈতালী ঘোষ

ওয়াল ক্রাফটস্ প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে পি, বাক্‌না কর্তৃক ২৫।১ কাশীপুর রোড, কাতা—১০০০০২ থেকে মুদ্রিত ও ১৯ টোলা স্ট্রীট কলকাতা—১০০০৭৩ থেকে ।শিত।

বিমান মাশুল : পঞ্চাশ পয়সা

## সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৪
চিঠিপত্র ৬
সূচীপত্র ৩

**বিশেষ রচনা**
শংখচূড়ের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে

**উপন্যাস**
হাবা/বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৭
গভীর রাতের আতঙ্ক/প্রণব সেন ৬২

**ছড়া ও কবিতা**
গোয়েন্দা কাহিনী/গৌরাঙ্গ ভৌমিক ৪০
ছড়া/সরল দে/৪০
ভূত ভূতুরে/বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী/৪০
দুষ্টু/জন কীটস/ভাষান্তর সুধীন্দ্র সরকার/৪১
ছুটির ছড়া/পঞ্চানন মালাকার ৪১
খুকুর ঘরকন্না/রাসবিহারী দত্ত ৪১
উচ্চারণ/রবীন সুর ৩২

**গল্প**
রাতের অতিথি/মনোজকান্তি ঘোষ ১৭
রামজীর এক্কাগাড়ী/প্রদীপকুমার দত্ত ২৬
বাজি/অভিজিৎ মিত্র ১৩
মুক্তি/নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩১
মহাকবির মহত্ত্ব/কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯

**আবিষ্কারের কাহিনী**
তরবারি/সুদেব বক্সী ৩৬

**অনির্বাণ দীপশিখা**
আব্রাহাম লিঙ্কন/রবীন্দ্রনাথ দেবপুত্র ৩৮

**বেড়াতে যাই**
নেপালের পোখরা/প্রতীক শর্মা ১১

**ম্যাজিক**
মজার ম্যাজিক/বি কুমার ১৪

**পুরস্কারের গল্প**
নোবেল পুরস্কার/কুমার গুপ্ত ২১

**সখের রাজ্য**
ডাকটিকিট/বিশ্বামিত্র কর্মকার

**দেশের কথা**
পশ্চিমের বিধানসভা/পুনশ্চ সান্যাল ৪২

**বিজ্ঞান বিচিত্রা**
ব্যাঙের ছাতা/অশেষ রায় ২২
শীতের অতিথি গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রেব/সন্দীপ সেন ২৫
বেবুন/বি কে সাহা ২৪
নিজে করে দেখ/সহজ প্রজেক্টর/শুভ্র দত্ত ২৩

**স্কুলের খবর**
দুই পড়ুয়ার কথা/শুভাশিস হালদার ৫২
সুরশুনা হাইস্কুলের ল্যাবরেটরী/লাইব্রেরী/সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১

**মাঠে ময়দানে**
গোল্ডেন বয় গাওস্কার/সাজাহান সিরাজ ৫৫
একটি অবিস্মরণীয় ইনিংস/রাজীব কুমার দাস ৫৮
শুরুতেই সেঞ্চুরী/হান্নান আহসান ৬০
অ্যালবাম ৫৬
স্পোর্টস কুইজ/ক্রীড়ানন্দ কর্মকার ৫৯

**কমিকস্/চিত্রকাহিনী**
আরব্য রজনীর গল্প/মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪, ৩৫
কালো মানিকের ডায়েরী/অর্জুন দাস ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

**অন্যান্য আকর্ষণ**
বিচিত্র দুনিয়া/বিকাশকান্তি সাহা/মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।
অশেষ রায় ১৬
মণিমুক্তা/সংকলন : লিলি ৩৩
জ্যোতিষ্ক/অমলেন্দু ঘোষ ৩৩
ধাঁধা/প্রণব হোড় ৪৭
শব্দ নিয়ে খেলা/ধ্রুব ভট্টাচার্য ৪৭
গল্প/ছড়া প্রতিযোগিতা ৪৮
হাসাহাসি/অতীন বসু ৪৯
কুইজের আসর/পরিচালনা কুইজ মাস্টার ৫০
জানো কিনা জানিনা/বিদ্রোহেন্দ্রনাথ চন্দ ৫০
টুকিটাকি/গৌতম ঘোষ ৫৩
যেমন খুশি বন্ধু কর/৬৬
টাটকা বই/চৈতালী ঘোষ ৬৫

প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
অলংকরণ : রতন মুখোপাধ্যায়

অনেক প্রতিকুলতা অতিক্রম করে
কিশোর সঙ্গী প্রকাশিত হল। তার
চলার পথে একাধিক সহযোদ্ধা।
বীরবিক্রমে এগিয়ে চলার লক্ষ্য
আমাদেরও। আমরা এগোবো,
লক্ষ্য জয়।
দীর্ঘপথ আমাদের অতিক্রম করতে
হবে। সে পথে কখনো সুখ,
কখনো বা বিষাদ। তোমাদের
সহযোগিতা, সহানুভূতি,
সুহৃদজনের আশীর্বাদ আমাদের
সাফল্যের চাবিকাঠি।
কিশোর সঙ্গীর আঁশশবে অনেক
গুণীজনের অমূল্য পরামর্শ
আমাদের কাঙ্ক্ষিত পথে এগোতে
সাহায্য করেছে।
অনেকের শুভেচ্ছা আমাদের
বাড়তি মনোবল এনে দিয়েছে।
সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে
ঋণ স্বীকার করছি।
কিশোর সঙ্গী প্রকাশিত হচ্ছে জেনে
অনেকে আমাদের কাছে চিঠি
পাঠিয়েছেন। কেউ কেউ লেখা
দিয়েছেন। কেউ কেউ পত্রিকার
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা
করেছেন।
সবার জন্য আমাদের
অভিনন্দন রইল।
৬৪ পাতার পত্রিকায় আমরা অনেক
বেশী বিভাগ এবং বিষয় রাখতে
চেষ্টা করেছি। বিভাগ এবং
বিষয়গুলি আকর্ষণীয় করে
তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।
ভাষা প্রাঞ্জল, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক হওয়ার
দিকেও সযত্নে নজর দিয়েছি।
পত্রিকা যখন তোমাদের হাতে
পৌঁছবে, বুঝতে পারবে, কী
কী নেই বা আর কী কী হলে ভাল
হতো।
সে সব কথা লিখে আমাদের
জানাও।
আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

# পুষে রাখা শংখচূড়ের ডিম ফেটে বাচ্চা

ক'দিন আগে মাদ্রাজ সর্পোদ্যানের মুখপত্র 'হ্যামাড্রিয়াড' ( Hamadryad )-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। খবরে প্রকাশ, মাদ্রাজ সর্পোদ্যানে নাকি এক শংখচূড়ের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে এটা নাকি দ্বিতীয় রেকর্ড। সাথে সাথে যোগাযোগ করলাম মাদ্রাজ সর্পোদ্যানের স্থানীয় বিজ্ঞান সহকর্মী বিকাশকান্তি সাহা'র সাথে। 'কিশোর সঙ্গী'র আবেদনে সাড়া দিলেন শ্রীসাহা 'হ্যামাড্রিয়াড'-এর সম্পাদক জাহিদা হুইটেকারের ( Zahida Whitaker ) কাছে চেয়ে পাঠালেন ঐ বিরল ঘটনার একটা আলোকচিত্র। শেখর দাত্তারি'র ( Shekar Dattari) তোলা সেই আলোকচিত্রও এসে পৌছল সাথে সাথে শ্রীসাহার সহায়তায় উপস্থাপিত হল সেই আলোকচিত্র ও ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

সম্পাদক

**কিশোর সঙ্গী**

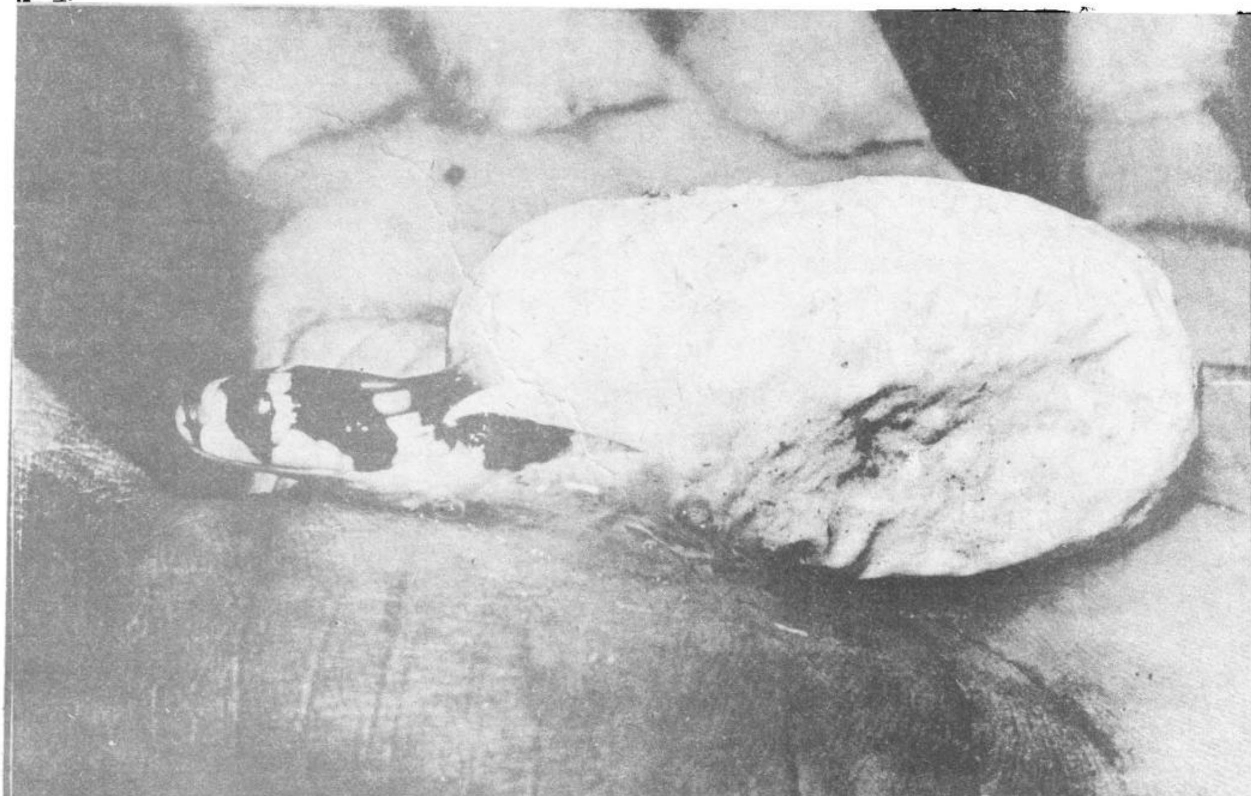

পুষে রাখা সাপ সচরাচর ডিম পাড়ে না কিংবা বাচ্চাও প্রসব করে না। তবে মাঝে মধ্যে এই রেকর্ডও ভঙ্গ হয়। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এমনি এক রেকর্ড ভঙ্গ করে এক মেয়ে শংখচূড় ডিম পাড়ল এবং ডিম ফুটে বাচ্চাও বেরুলো। ঘটনাটি ঘটেছে মাদ্রাজ সর্পোদ্যানে। পুষেরাখা অবস্থায় শংখচূড় সাপের ডিম পাড়া ও ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার এটা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় নজির এবং এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম। এর আগের ঘটনাটি ঘটেছিল বেশ কয়েকবছর আগে নিউইয়র্ক জুওলজিকাল পার্কে।।

# চিঠিপত্র

কিশোর সঙ্গী বেরুচ্ছে জেনে অনেকেই আমাদের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন। এক একজনের বক্তব্য এক এক রকম। পত্রিকা সুন্দর, মনের মতন হয়ে উঠুক সবাই কামনা করেছেন। প্রথম সংখ্যা বলেই চিঠি ছাপছি না, এরকম ধারণা আমাদের নেই। শুরুতেই পাঠক সাধারণকে খুশি করতে পারছি, সেজন্য আমরা গর্বিত। সবার চিঠি প্রকাশ করতে পারলাম না দেখে নিরাশ হবার কারণ নেই, পর্যায়ক্রমে সব চিঠিগুলিই আমরা প্রকাশ করবো। আমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন।

## নতুন ভাবে চাই

জেনে খুশী হলাম। হঠাৎ 'কিশোর সঙ্গী'কে ছোটদের মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশের কথা জেনে। সফল হউক আপনাদের চিন্তা ভাবনা। যদি ছবির সাথে ছড়াকে তুলে ধরেন, তাহলে ছোটদের মনঃপূত হবে পত্রিকাটি। আশা করব 'কিশোর সঙ্গী' ছোটরা জীবনের চলার সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করবে। 'কিশোর সঙ্গী'কে একেবারেই অন্য ধরণের পত্রিকারূপে দেখতে চাই। যা গতানুগতিক সব ম্যাগাজিন থেকে স্বতন্ত্র হবে।

পল্লব রায়
সন্দেশখালি, ২৪ পরগণা

## রূপকথা চাই

ফুল, পাখি প্রজাপতি, জন্তু জানোয়ার, ভূত, রাক্ষস-খোক্কস, ডাইনী, দৈত্য-দানো, রাজা-রানী, এসবই শিশুর প্রিয়। আর এসব মশলা দিয়ে তৈরী রান্না সাহিত্য পেলে শিশুর মনে হয় এক সুপ্রতিক্রিয়া। শিশুর মন ভীষণ ভাবে স্পর্শ করে। তারা এ নিয়ে তৈরী ছড়া গপ্প কণ্ঠস্থ করে। শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় যে কাহিনী তা হ'ল রূপকথা। বীর রাজকুমার ও বন্দিনী রাজকুমারীর গপ্প তারা ভীষণ ভালবাসে। দীর্ঘ গপ্প, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ শিশুদের ঠিক পছন্দ নয়। তাই শিশুদের চাওয়ার ওপর নির্ভর ক'রে ক'রে পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব নিন।

দেবাশীস দত্ত
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

## হাফ ডজন ছড়া

আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন। 'কিশোর সঙ্গী'-র বিজ্ঞাপন দেখে খুবই খুশী হলাম। কিশোর-কিশোরীদের জন্য চাই রঙীন সপ্নে মোড়া সার্থক একটি মনের মতন পত্রিকা। খুন বা হিংসার কথা নয়। চাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ঐতিহাসিক গপ্প বা কিশোরদের মনের মতো মানুষদের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। তবে প্রতি সংখ্যাতেই চাই অন্ততপক্ষে হাফ ডজন ছড়া ও পদ্য। কেননা, ছড়া সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের অন্যতম প্রিয় বিষয়। যাই হোক আপনাদের পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

কাজী নুর শিদুল আরেফিন
খোলপোতা, ২৪ পরগণা

## কম্পিউটর সম্বন্ধে

নতুন পত্রিকা 'কিশোর সঙ্গী' প্রকাশ হচ্ছে শুনে খুব ভাল লাগল। একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকা পেতে আমরা সর্বদাই আগ্রহী, তাই একজন শুভানুধ্যায়ী হিসেবে কিছু মতামত পাঠালাম। যেহেতু পত্রিকাটি কিশোর কিশোরীদের জন্য তাই ছেলে-ভুলানো রূপকথার গল্প বর্জন করাই শ্রেয়। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক বা এ্যাডভেঞ্চার মূলক গল্পগুলো যেন সত্যসত্যই বিজ্ঞান নির্ভর হয়। অন্যগ্রহের তিন-পা-ওলা জীব পৃথিবীতে এসে একটি কিশোর বা কিশোরীকে ফার্স্ট করিয়ে দিল বা খেলায় সেরা খেলোয়াড় ক'রে দিল— এরকম ধরণের গল্পগুলো মোটেই বিজ্ঞান নির্ভর নয়। তাই গল্পের বাছবিচার ক'রে নির্বাচন করবেন। আর রাখবেন কম্পিউটার সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা। এতে সব কিশোর কিশোরীদেরই বিশেষ সুবিধা। এতে সব কিশোর কিশোরীদেরই বিশেষ জ্ঞান হবে।

কৌশিক ঘোষ
১০ বি, গ্রোভ্ লেন
কলি—২৬

## পরীক্ষার খবর চাই

কিশোর সঙ্গী নামে একটি নতুন মাসিক পত্রিকা বে'র করতে যাচ্ছেন শুনে খুবই আশান্বিত হলাম। পত্রিকাটিকে তাড়াতাড়ি দেখতে চাই। পাঠকদের মতামত জানতে চেয়েছেন জেনে আরও খুশী হয়েছি। বাঙলা ভাষাতে বেশ কয়েকটি কিশোর পত্রিকা আছে, কিন্তু সেগুলির ভূমিকা আমাদের খুশী করে না। অবশ্য একটি দুটি ব্যতিক্রম। বাঙলায় 'কেরিয়ার ডাইজেষ্ট' বা 'কমপিটিশন্ মাষ্টার' এর মত পত্রিকা একটিও নেই। আপনাদের পত্রিকা কিছুটা এদেরই মত হ'লে মন্দ হয় না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যাপারও জানতে আগ্রহী। আশা করি আমার অনুরোধ ভেবে দেখবেন।

বিনয় ঘোষ
ধর্মনগর
উত্তর ত্রিপুরা

## মহাকাশের রহস্য

ইতিহাসের কথা তথ্যনির্ভর বৈজ্ঞানিক গল্প, অ্যাডভেনচার ইত্যাদি এর অঙ্গীভূত হওয়ার প্রয়োজন। সেইসঙ্গে চাই মহাকাশের রহস্য উন্মোচন সংক্রান্ত তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ। যা কিশোর কিশোরীদের মধ্যে মহাকাশ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করবার সুযোগ দেবে।

অজয়কুমার নাগ
চমকা, পপর আড়া
মেদিনীপুর

উপন্যাস

# হাবা

## বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে হাবার মনে হল ওর আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। গোবিন্দ স্যারের কাছে কানমলা খেলে ওর কিছু বলার থাকত না, কিন্তু যেভাবে ক্লাসের সবাইকে দিয়ে লাইন করিয়ে ওর কান মলানো হল, তাতে অপমানের একেবারে চূড়ান্ত। এরপর যদি ওর মান সম্মান বলে কিছু থাকে, তা হলে ওই ক্লাসে আর ওর না যাওয়াই উচিত।

কিন্তু ইস্কুলে যাব না বললে শোনে কে! প্রথমেই তো খিচ খিচ শুরু করে দেবে ওর মা। কি রে, স্কুলে যাবি না? এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ যে বড়? কটা বাজে?

বাবাও ছেড়ে কথা কইবে না, দিন দিন গোল্লায় যাওয়া হচ্ছে বুঝি? তোদের মতো বয়সে আমরা আঠারো ঘন্টা করে পড়তাম জানিস, আর তুই? তুই তো দেখছি পাঁচ মিনিটও বই নিয়ে বসিস না। হল কি তোর?

বাবা মা সারাক্ষণ যেন এঁটুলির মতো পেছনে লেগে থাকে। সারাক্ষণ অত উপদেশ আর শাসন করে ভাল লাগে! হাবা ঠিক করল, বাড়িতেই আর ফিরবে না ও। একে ইস্কুলের এই অপমান, তায় বাড়ির খিঁচ খিঁচ, এর চে ওর জীবন বিসর্জন দেওয়াই উচিত।

'জীবন বিসর্জন' কথাটা ভাবতেই বেশ উৎসাহ বোধ করল ও। কিন্তু কিভাবে? রেল লাইনে মাথা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেবার ওদেরই গাঁয়ের একটা লোক ওই ভাবে রেল লাইনে কাটা পড়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল।

পুরো দৃশ্যটাই ওর চোখের ওপর ভেসে উঠল। আজ থেকে প্রায় বছর দেড়েক আগের কথা। তখন ও ফাইবে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার মুখে শুনতে পেল, কে যেন ট্রেনে কাটা পড়েছে। ব্যস আর যায় কোথায়! স্কুলে যাওয়া সিকেয় উঠল, বই বগলে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছিল দেখতে। যা দেখল, তাতে ওর চোখ ছানাবড়া। এ্যাঁহ, এ যে তিন চার টুকরো হয়ে গেছে লোকটা। কি রক্ত! ব্যাপস।

বেশিক্ষণ তাকাতে পারে নি ও। এ দৃশ্য কি বেশিক্ষণ দেখা যায়! লোকটার ধড় মাথা সব আলাদা। কে বলবে, ট্রেন পাস করার আগেও লোকটা দিব্যি বেঁচে ছিল। পালিয়ে এসেছিল হাবা।

নাহ্, ট্রেনে কাটা পড়ে জীবন বিসর্জন দেওয়াটা খুব খারাপ। মৃত্যুর পর সবাই এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, এটা না হওয়াই ভালো। তবে কিভাবে জীবন বিসর্জন দেওয়া যায়! মনে পড়ল, জলে ডুবে মরলে কেমন হয়। জলে ডুবে মানে যে কোন একটা পুকুরে ঝপ করে লাফিয়ে পড়লেই কি মরা যাবে! ও সাঁতার জানে যে! জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো ও সাঁতার কাটতে শুরু করবে। সাঁতার যে জানে সে কি সাঁতার না কেটে পারবে!

ধুত, জলে ডোবা টোবা ওর দ্বারা হবে না। হত, যদি গায়ে একটা বিরাট পাথর বেঁধে ও জলে লাফিয়ে পড়তে পারত, তাহলে সেই পাথরের ওজনে ও তলিয়ে যেতে

পারত। কিন্তু এখন পাথর জোগাড় কর, দড়ি জোগাড় কর। অত জোগাড় যন্ত্র করে মরা যায় না।

তাহলে কি ভাবে জীবন বিসর্জন দেওয়া যায়! গলায় দড়ির কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল গায়ে কেরসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু না, কোনটাই খুব যুতসই নয়। এমন ভাবে জীবন দিতে হবে যেন পরে কেউ আর ওকে খুঁজেই না পায়। না ইস্কুলের মাস্টার মশাইরা, না বাড়ির কেউ।

হাবা একা একা হাঁটতে শুরু করল নদীর দিকে। ঘন্টা দুয়েক হল স্কুল ছুটি হয়েছে। ছেলেরা সব হৈ হৈ করে বাড়িও ফিরে গেছে। স্কুল থেকে হাবাদের বাড়ি মিনিট পনেরর পথ। ছুটে গেলে পনের মিনিটও না। ওর মনে পড়ল, রোজকার মতো ওর মা হয়তো আজও ওর জলখাবার নিয়ে বসে আছে। বাবার ফিরতে ফিরতে রোজই কিছুটা রাত হয়ে যায়। কোন কোন দিন এত রাত হয় যে হাবা ততক্ষণে ঘুমিয়েই পড়ে। হে ভগবান, আজও যেন বাবা বেশ দেরি করেই ফেরেগো। ততক্ষণে যে ভাবেই হোক জীবন বিসর্জন দেওয়া টেওয়া সেরে ফেলতে পারে হাবা। একবার ওর জীবন বিসর্জন দেওয়াটা হয়ে গেলে তখন আর কে মাথা ঘামায়।

স্কুল থেকে নদীটা খুব কাছেও নয়। মাঝখানে ঢুলঢুলির জঙ্গল। জঙ্গল এমন গভীর যে সাপ বাঘ লুকিয়ে থাকাও অসম্ভব নয় ওখানে। সত্যি সত্যি বাঘ আছে কিনা তা অবশ্য কেউ কোনদিন বলে নি। তবে হাবার বিশ্বাস, অমন জঙ্গলে বাঘ না থেকেই যায় না। বাঘ যদি নাও থাকে সাপ শেয়াল তো আছেই। একা একা কেউ কোন দিন ও জঙ্গলে ঢুকেছে কিনা সন্দেহ। গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা অনেক সময় ওই জঙ্গলে শুকনো কাঠপাতা কুড়োবার জন্য যায়, কিন্তু কখনো একা যায় না। যায় দল বেঁধে। সে দিক বিচার করলে হাবারও ওই জঙ্গলে একা ঢোকা উচিত নয়। কিন্তু হাবা ভেবে দেখল, ওর কি, ওতো জীবনই বিসর্জন দেবে, ওর একা যাওয়া না যাওয়া সবই সমান।

ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল হাবা। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে চলা একটা রাস্তাও রয়েছে। চার-পাশে বড় বড় সব গাছ। কোথাও আবার বেত আর বাঁশের ঝোপঝাড়। কোথাও বিছুটি, কোথাও আবার কত সব লতা পাতা।

গাটা একটু ছমছম করতে লাগল। এমনিতেই এখন সন্ধ্যা হওয়ার সময়, তায় জঙ্গলের ভিতর যেন রাত্রিই নেমে এসেছে। আকাশ টাকাশ কিছুই চোখে পড়ে না। সামনে কয়েক হাত তফাতের জিনিসও ভাল করে দেখা যায় না।

এই জঙ্গলে ডাকাত টাকাতের আস্তানা আছে কিনা তাই বা কে বলবে। এখনই যদি ডাকাতরা খাঁড়া হাতে তুলে হৈ হৈ করে ওর দিকে এগিয়ে আসে! হাবার সাধ্য নেই ডাকাতের হাত থেকে বাঁচে। ওর গায়ে এমন কিছু জোর নেই যে ডাকাতদের ও কাবু করে ফেলবে। ডাকাতরা ওর জামার কলার ধরে পাখির ছানার মতো তুলে ওদের মাকালীর কাছে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাচাং করে বলি দিয়ে দিতে পারে।

দিক না, কি আসে যায় ওর। এ জীবন তো বিসর্জনই দেওয়ার জন্য বেরিয়েছে ও, ডাকাতের হাতেই জীবনটা যাক না ওর।

পরক্ষণেই মনে হল ডাকাতের হাতে এভাবে ওর জীবন দেওয়া কি উচিত! ডাকাতরা তো ভাল লোক নয়। ভাল লোকের হাতে যদি ওর প্রাণ যায় তা হলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু যারা সমাজের শত্রু তাদের হাতে এভাবে প্রাণ দেওয়াটা ঠিক হবে না ওর।

একটু থমকে দাঁড়াল হাবা। চারপাশে এখন এমন জঙ্গল যে কিছুই ঠাহর করার উপায় নেই। এমন কি এখন যদি ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তাও মনে হচ্ছে অসম্ভব। বেরুবার পথ কোথায় রে বাবা! পায়ে চলা যে পথটা লক্ষ্য করে করে ও এগোচ্ছিল, সেই পথটাও যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

সর্বনাশ, কি হবে তাহলে। একে এই রাত্রি, তায় জঙ্গল, এখানে ভূতটুত নেই তো?

ভূতের কথা মনে পড়তেই সারা গায়ে আবার কাঁটা দিয়ে ওঠে ওর। যার সঙ্গে যত কিছুই কর না বাবা, ভূতের সঙ্গে কোন চালাকি খাটে না। ওরা যদি এখন দল বেঁধে ওর দিকে তেড়ে আসে তা হলেই হয়েছে আর কি! ভূতেদের নিয়ে সবচে বড় ঝামেলা, সব সময় ওদের চোখে দেখা যায় না। ইচ্ছে মতো ওরা যেখানে সেখানে চলেফিরে বেড়াতে পারে। ইচ্ছে মতো ওরা খনা গলায় হেসে উঠতে পারে। ওদের যদি গুলি করেও মারতে চাও, তাও উপায় নেই। ভূতেদের গায়ের ভিতর দিয়ে গুলি পাস হয়ে যাবে, তবু ওদের মৃত্যু নেই।

আসলে ভূতেদের মরার কোন প্রশ্নই আসে না। মৃত্যুর

পরই তো মানুষ ভূত হয়। যে একবার মরে ভূত হয়েছে সে দ্বিতীয়বার আবার মরে কি করে।

এপাশ ওপাশ তাকায় হাবা। বড্ড ভুলই হয়ে গেছে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে। তা ছাড়া একটু ক্ষিধে ক্ষিধেও পাচ্ছে। এতক্ষণ ক্ষিধে টিধের কথা সবই ভুলে ছিল ও, কিন্তু রাত যত বাড়বে ক্ষিধেও তত বাড়বে। সারা রাত কি না খেয়ে কাটানো যাবে!

জঙ্গলের মধ্যে না ঢুকে এর চেয়ে ভুলভুলির বাজারের দিকে গেলে কিছু তেলেভাজা টাজা এতক্ষণ খাওয়া যেত। কিংবা গরম জিলিপি টিলিপি। পকেটে যে একটা এক-টাকার নোট রয়েছে, এখন মনে পড়ল। টাকাটা ওর বাবা ওকে দিয়েছিল পেন্সিল কেনার জন্য। হাবা ভেবে রেখেছিল, স্কুল থেকে ফেরার সময় পেন্সিল কিনে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু আর পেন্সিল কিনে কি হবে। হাবা তো আর বাড়ি ফিরে যাচ্ছে না, বা ইস্কুলেও আর ওকে যেতে হবে না তা হলে কি প্রয়োজন আর পেন্সিলের। ভুলভুলির বাজারের দিকে গেলে অনায়াসে টাকাটা খরচ করা যেত।

কিন্তু এখন এই জঙ্গলের ভেতর থেকে কি করে বেরুবে ও। চিৎকার করে কাউকে যে ডাকবে তারও উপায় নেই। চিৎকার করলে ধরা পড়ে যাবে হাবা। আর ধরা পড়লে ওকে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। ফলে আবার খিঁচখিঁচ আবার বকুনি, আবার স্কুল। জীবন বিসর্জন দেওয়া আর হয়ে উঠবে না ওর।

যা থাকে কপালে অন্ধকারের মধ্যেই আবার হাঁটার চেষ্টা করে ও। সড়সড় করে কি যেন একটা ছুটে গেল না সামনে দিয়ে! কি রে বাবা, কি হতে পারে। বাঘ না তো! ভয়ে সিঁটিয়ে যায় ও।

না না, বাঘ না, বাঘ হলে পালাবে কেন! বাঘ হলে তো হালুম করে এতক্ষণ লাফিয়ে পড়ত ওর ওপর। তাহলে?

তাহলে শেয়াল হতে পারে। যাকৃগে, যেই হোক, পালিয়ে তো গেছে, তেড়ে তো আসেনি, ব্যাস।

আবার এগোতে থাকে ও। আর এ সময় সামনেই একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ আবার ছানাবড়া। ওগুলো কিরে বাবা! বিন্দু বিন্দু অত আলো জ্বলছে কেন ঝোপটার মধ্যে। জ্বলছে আর নিভছে। ভূতটূত না তো!

আলোর কণাগুলো বুঝতে ওর একটু সময় লেগে গেল। আসলে ওগুলো জোনাকি। অসংখ্য জোনাকি। এ রকম জঙ্গলে জোনাকি থাকাই স্বাভাবিক। এ রকম জঙ্গল থেকেই হয়তো কখনো সখনো দুটো একটা জোনাকি ওদের বাড়ি অবধি চলে আসে। রাতে ওর মশারীর গায়ে এসে বসে।

জোনাকিগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে হাবা। তারপর আবার এগোতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি জঙ্গলটা এখন পার হতে পারলে বাঁচা যায়। জঙ্গলটা পার হলেই নদী। নদীতে কোন নৌকো টৌকো যেতে দেখলে তাতেই উঠে বসবে ও। তারপর পেটপুরে কিছু খেয়ে নিতে হবে আগে। মাঝিরা যদি এমনিতে ওকে কিছু খেতে দিতে না চায়, তাহলে টাকাটা দিয়ে কিনে খাবে ও। ক্ষিধেয়

পেট জ্বলে যাচ্ছে ওর। জীবন বিসর্জন দেওয়ার আগে কিছু না খেয়ে নিলেই নয়।

একটা গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেল হাবা। উহ্ বাপরে! বসে পড়ে পা চেপে ধরল। এই অন্ধকারে কিছু ছাই দেখা যায়।

পায়ে ওর কেডস। ফিতেটা আলগা হয়ে গিয়েছিল, আবার তা টাইট করে বেঁধে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক এই সময় মেঘ ডাকার মতো একটা শব্দ।

যাহ্ বাবা, বৃষ্টি নাববে না তো! আকাশের দিকে তাকাল ও। আকাশের চেহারাও দেখার উপাই নেই। গাছের ডালে পাতায় আকাশটা ঢাকা পড়ে আছে। সামনে যেমন অন্ধকার, ওপরে আকাশের দিকেও তেমনি অন্ধকার।

সত্যি সত্যি যদি বৃষ্টি নামে ডাঁহা ভিজতে হবে তাহলে। এই অন্ধকার রাত্তিরে এই জঙ্গলের ভিতর জলে ভিজলে জ্বর কে আটকায়। এমনিতে একটু ঠাণ্ডা লাগলেই ওর জ্বর হয়, সর্দি হয়। আজ আর দেখতে হবে না। জ্বর হবেই।

আবার সেই গুড়গুড় শব্দ। কিসের শব্দ রে বাবা।

না ঠিক মেঘ ডাকার মতো নয়। মনে হচ্ছে যেন একটা এরোপ্লেন উড়ছে।

আকাশে এরোপ্লেন উড়বে তাতে আর বেশি কি!

আবার আকাশের দিকে তাকাল হাবা, আর এসময় যেন ও নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। লাল নীল সবুজ হলুদ নানা রকম রং দিয়ে সাজানো একটা হেলিকপটার। ঠিক ওর মাথার ওপরই উড়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে? আলোগুলি ম্যাজিকের মতো জ্বলছে আর নিভছে।

এখানেই নামবে নাকি হেলিকপ্টারটা! কিন্তু নামবে কি ভাবে, গাছের ডালে পাতায় আটকে যাবে যে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হাবা। বুঝতে পারে না হেলিকপ্টারটার কি উদ্দেশ্য!

হঠাৎ কেমন সন্দেহ হয়, হেলিকপ্টারইতো, না আর আর কিছু! পাখির ডানার মতো দেখাচ্ছে কেন দুপাশে। পাখির মতো ছুঁচলো গলা কেন সামনের দিকে। হেলিকপ্টারে কি ওরকম হয় নাকি! তা ছাড়া হেলিকপ্টারের পিঠের ওপর যে পাখাটা থাকে সেটাও নেই। কি অদ্ভুত ব্যাপার রে বাবা। কি হতে পারে তাহলে!

পাখিও নয়, পাখি কি হেলিকপ্টারের মতো অত বড় হয় নাকি। কেমন গোলোক ধাঁধায় পড়ে যায় ও।

আর ঠিক এ সময়ই তীব্র এক ঝলক আলো নেমে আসে নিচের দিকে। নেমে আসে একেবারে হাবাকে লক্ষ্য করে। বাপ্‌রে কি আলো, দু'হাতে চোখ ঢাকে হাবা।

কিন্তু ব্যাপারটা কি হতে চলেছে না দেখেও উপায় নেই, আবার চোখ খোলে। খুলেই অবাক চোগা চাপকান পরা ইয়া লম্বা একটা লোক ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এ কি ম্যাজিক নাকি, কোত্থেকে এল ও।

হাবা লোকটার আপাদ মস্তক একবার দেখে নিল, মাথায় ময়ূরের পালক গোজা একটা টুপি পায়ে ছুঁচলো নাগরাই। গায়ে ঝলমলে জামা।

চোখে চোখ পড়তেই লোকটা কুর্নিশ করল হাবাকে, স্যার, অপরাধ নেবেন না, আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

হাবাতো অবাক, এই ধুমশো লোকটা আপনি আপনি করে কথা বলে যে। ও কি ঠাট্টা করছে নাকি ওকে নিয়ে।

—আমাকে নিয়ে যেতে মানে! কে আপনি?

লোকটা হাত কচলাতে শুরু করল, আমাকে স্যার আপনি করে ডাকবেন না। আমি স্যার আপনার হুকুম তালিম করার জন্য এসেছি।

বলে কি লোকটা। হাবা জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

—আজ্ঞে স্যার আমি কানাই, পক্ষিরাজে বলাই রয়েছে। আমরা দুজন আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—পক্ষিরাজ?

—ওই যে স্যার উপরে রয়েছে। এত জঙ্গলের ভেতরে ওটা নামতে পারছে না বলে ওপরে রয়েছে। ওখান থেকে এই যে দড়িটা ঝুলছে ওটা ধরে আমি নেমে এসেছি। এই দড়ি ধরেই আপনাকে নিয়ে আমি ওপরে উঠব।

—কোথায় যেতে চাও আমাকে নিয়ে?

—আজ্ঞে স্যার, আপনি তো জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন, তাই আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছি।

ধারাবাহিক

# নেপালের পোখরা

প্রতীক শর্মা

যারা বেড়াতে ভালবাসো তাদের নিজস্ব বিভাগ এটি। কোন উল্লেখযোগ্য স্থান ঘুরে এসে তোমরাও এখানে লিখতে পারো। প্রথম সংখ্যায় 'নেপালের পোখরা' ছাপা হ'লো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।

ঘুমটা বেশ তাড়াতাড়িই ভেঙে গেল। ভেঙে গেল স্বপনের চেঁচামেচিতে 'চমৎকার স্নো-পিক দেখা যাচ্ছে। দেখবি তো ছাদে চল।'

পিক দেখতে ছাতে যেতে হবে? এত ভোরে? এই শীতের মধ্যে? আমি লেপটা আরো ভালো করে জড়িয়ে শুলাম।

স্বপন এবার আমাকে ধমক দিল: 'কলকাতা থেকে পোখরা এসেছিস কি লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমোবার জন্য? এক্ষুনি উঠে পড়।'

অগত্যা উঠতেই হলো। জয়ন্তর বিছানাও দেখলাম খালি। জিজ্ঞাসা করলাম 'জয়ন্ত কোথায়?' স্বপন বলল 'ছাদে গেছে অনেক আগেই। চট্‌পট্‌ চল্‌।'

তাড়াতাড়ি স্যুটকেস খুলে যতগুলো গরম পোশাক ছিল একের পর এক পরে ফেললাম।

হোটেলের ছাতে উঠে দেখি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। উত্তর দিকে দৃষ্টিপথ আড়াল করে দাঁড়িয়ে একের পর এক পর্বতশৃঙ্গ অন্ধকার তখনো ভালো করে কাটে নি। কিন্তু গিরিরাজের শ্বেতশুভ্র বরফাবৃত দেহ তার মধ্যেই সুস্পষ্ট।

জয়ন্ত ওদিকে দাঁড়িয়ে ওর ক্যামেরা ফোকাস করছিল আমাদের দেখে এগিয়ে এলো। বলল 'ঐ পিকগুলোর নাম জানিস?'

আমাদের ডানপাশে বাঁপাশে মাথা নাড়তে হলো। স্বপন বললো, 'আমি একটার নাম জানি! ঐ মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু যেটা। ওটার নাম মচ্ছপুছারে। ম্যাগাজিনে আগে ছবি দেখেছি।'

'নামটা ঠিকই বলেছিস, তবে ওটা সবচেয়ে উঁচু নয় মোটেই।' জয়ন্ত বলল মচ্ছপুছারের বাঁদিক দিয়ে যে পিকটা দেখতে পাচ্ছিস ওটাই সবচেয়ে উঁচু; ওটার নাম অন্নপূর্ণা ওয়ান। মচ্ছপুছারের ডানদিকে পরপর দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণা থ্রি, ফোর আর টু। আর সবচেয়ে বাঁদিকে দেখতে পাচ্ছিস অন্নপূর্ণা সাউথ। সবকটাই অন্নপূর্ণা রেঞ্জের মধ্যে পড়ে।'

আমি জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলাম 'ধওলাগিরি আর লামজাং হিমল কোন দুটো?'

জয়ন্ত বলল, ধওলাগিরি সবচেয়ে বাঁদিকে দেখা যাওয়ার কথা; মেঘে ঢাকা পড়েছে।

'আর লামজাং হিমল?'

'ওটা সবচেয়ে ডানদিকে দেখা যাওয়ার কথা। মেঘে ঢাকা পড়েনি, তবে ঢাকা পড়েছে সামনের ঐ বড় হোটেলটায়। রাস্তায় বেরোলে দেখতে পাবি।'

ততক্ষণে সূর্য ওঠার সময় হয়ে এসেছে। লালের ছোঁয়া লাগল প্রথমে উঁচু চূড়াগুলোতে। ধীরে ধীরে সেই লাল ছড়িয়ে পড়ল অন্য সব শৃঙ্গে। প্রথম অন্নপূর্ণার সুউচ্চ শিখরে, চতুর্থ অন্নপূর্ণার ছড়ানো পিঠে দ্বিতীয় অন্নপূর্ণার খাড়া দেয়ালে, মচ্ছপুছারের ধারালো দেহে খেলা করতে লাগল সেই রঙ। সেই অবর্ণনীয় দৃশ্যের সামনে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা।

দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় খাওয়ার টেবিলে আলাপ হল এক ভদ্রলোকের সাথে; তাঁর নাম অবিনাশ সেন। দুর্গাপুরে থাকেন; নেপাল বেড়াতে এসেছেন সপরিবারে। কাঠমাণ্ডু হয়ে পোখরায় এসে পৌঁছেছেন গতকাল সন্ধ্যাবেলায়।

কথায় কথায় অবিনাশবাবু বললেন, 'মচ্ছপুছারে মানে জানেন তো? মাছের লেজ।'

ডাইনিং রুমের জানলা দিয়ে মচ্ছপুছারে দেখা যাচ্ছিল। সেদিক তাকিয়ে স্বপন বলল, 'মাছের লেজের সঙ্গে চেহারায় কোন মিল নেই কিন্তু!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আছে। ঐ পর্বতের দুটো চূড়া পাশ থেকে দেখতে রুই কাৎলার লেজের মতই অনেকটা। এখান থেকে দেখলে দুটো চূড়াই এক লাইনে পড়ে, তাই বোঝা যায় না। মুক্তিনাথের পথে যদি হেঁটে যান, তবে

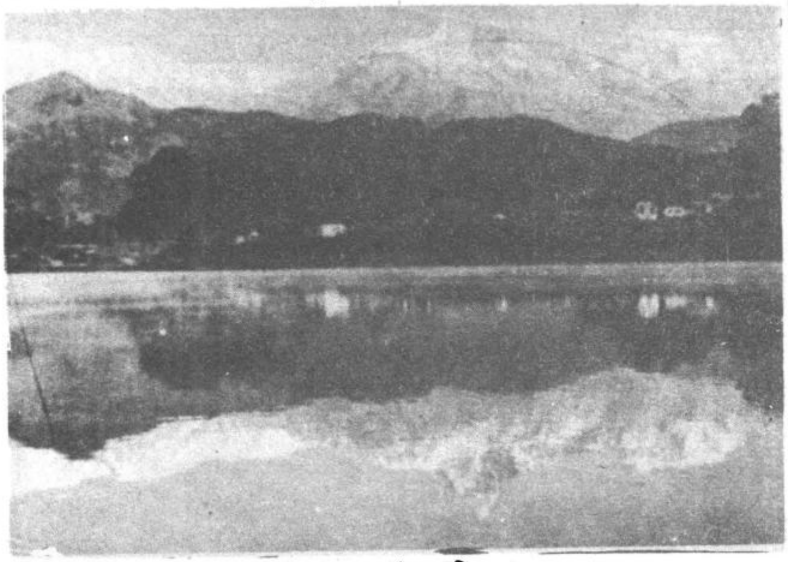

ফেওয়া হ্রদে পর্বত শ্রেণীর ছায়া।

দিনের পথ গেলে সেই যমজ শৃঙ্গের দৃশ্য দেখতে পাবেন।'

আমাদের নিয়ে জাপানী টয়োটা গাড়িখানা ছুটে চলেছে শহরের পথ দিয়ে। এখানকার প্রায় সব ট্যাক্সিই টয়োটা। চড়াই উৎরাই পথে চমৎকার মসৃণ গতিতে চলছে। আমাদের ড্রাইভারের নাম শম্ভু; সে এখানকারই নেপালী।

শহর ছাড়িয়ে উত্তরমুখে প্রায় পনেরো মিনিট চলার পর আমরা উপস্থিত হলাম এক পাহাড়ের তলায়। এখানেই আছে বিখ্যাত 'মহেন্দ্র গুম্ফা, বা মহেন্দ্র গুহা। টিকিট কেটে আমরা গুহার ভিতরে ঢুকলাম। গুহার ভিতর স্বল্পোজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। এই গুহা নাকি আগে কয়েক কিলোমিটার লম্বা ছিল এখন গুহা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে; সব মিলিয়ে দৈর্ঘ্য কয়েকশ ফিট।

এরপর আমাদের ট্যাক্সি এসে থামল ডেভিল'স ফল্‌সে। ফেওয়া লেক থেকে জলধারা এসে পড়ছে এখানে। এই জলধারা গিয়ে মিশেছে মাটির তলায় কোন হ্রদে, মানুষ আজও তার খোঁজ পায়নি! ফেনিল জলরাশি ছুটে এসে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভূগর্ভে। পাথরে পাথরে আঘাতে সেই জল ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে; সৃষ্টি হয়েছে ভারি চমৎকার একটি রামধনু।

শম্ভুর কাছে শুনলাম এই জলপ্রপাতের নামের ইতিহাস। বছর পনেরো আগের কথা। এক ইউরোপীয় তরুণ দম্পতি স্নান করতে নেমেছিল এই জলধারায়। অকস্মাৎ জলস্রোত বৃদ্ধি পেয়ে মেয়েটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় পাতালে শোকার্ত তার সঙ্গী এই পাতাল গহ্বরটিকে অভিহিত করে 'ডেভিলস হোল' বা শয়তানের গহ্বর নামে এবং এই প্রপাতটির নাম হয়ে যায় 'ডেভিলস ফল'।

পোখরাতে ছোট বড় বেশ কয়েকটি লেক আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল ফেওয়া তাল। নেপালী 'তাল' শব্দের অর্থ লেক। এবার আমরা যাত্রা করলাম ফেওয়া তালের দিকে। এখানকার অন্যান্য হ্রদগুলি, বেগনাসতাল, রূপাতাল ইত্যাদির তুলনায় ফেওয়া তাল অনেক বিস্তৃত এবং শহরের অনেক কাছে। ওখানে যখন পৌঁছালাম তখন বেলা পড়ে এসেছে।

ফেওয়া লেক চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। মাঝে আয়নার মত পরিষ্কার স্বচ্ছ জলরাশি। তুষারশৃঙ্গশ্রেণীর ছায়া পড়েছে তাতে। ভারিসুন্দর শান্ত পরিবেশ। হ্রদের মাঝে দ্বীপে একটি ছোট্ট মন্দির। লেকের ধারে একসারি বোট বাঁধা। কেউ কেউ নৌকাভ্রমণ করছেন। মাঝে মাঝে ঘন সবুজ পাহাড়ের সামনে দিয়ে সাদা বকের সারি উড়ে যাচ্ছে।

আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করছি। এমন সময় একজন বোটম্যান আমাদের কাছে এসে পরিষ্কার বাংলায় বলল আপনারা লেকে বেড়াবেন? আমার বোট আছে।'

নেপালীর মুখে বাংলা শুনে আমরা তো অবাক। পরে শুনলাম, সে আগে ছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে; নকশাল আন্দোলনের সময় পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দেওয়ার পর এখন এখানে নৌকা চালায়।

তার নৌকোতেই উঠলাম আমরা। নৌকো চলল হ্রদের শান্ত জলের উপর দিয়ে। দুপাশে সবুজে ঢাকা পাহাড়ের স্তব্ধ নির্জনতা। সামনে বরফে ঢাকা মচ্ছপুছারে, অন্নপূর্ণা; অস্তগামী সূর্য শেষ বেলার লাল রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলেছে।

নৌকোর মুখ ঘুরল এবার। আমাদের ফেরার সময় হয়ে এল। দুদিনের অতিথি আমরা এখানে, ফিরতে তো হবেই। তাই ফেরার আগে অঞ্জলি ভরে সঞ্চয় নিয়ে যাই। ●

"অনেক টাকা কামালি আজ! নারে অরুণ।

"কামাবার কি আছে বাজি ধরলি, হারলি, আমার প্রাপ্য টাকা আমি নিলাম। এতে দোষের কি আছে রে ব্যাটা রমেণ"—

এরা দুইজনই একটা ছোট কারখানায় কাজ করে, মাইনে খুবই অল্প পায়। কিন্তু ওই অরুণটা, খালি বাজি ধরার অভ্যেস, আবার প্রতিবারই জেতে। আশ্চর্য! বাজির টাকা ধরে মাসে অনেক টাকা রোজগার করে। কারখানার লোকে আস্তে আস্তে, রোজ হারার পর আর ভয়ে ওর সঙ্গে কথা বলত না। কে জানে কি বলে ফেলে ফের হেরে যাবে। ছোট কারখানা তাই কিছুদিনের মধ্যেই এক অফিসারের কানে গেল, মানে মুখার্জী বাবুর কানে। তাই একদিন একটা কাজে, অরুণ ওনার কাছে যেতেই তিনি বললেন, আমায় বাজিতে হারাতে পারবে?

অরুণ হেসে উত্তর দিল, "কেন পারব না স্যার। তবে ইয়ে—কি বিষয়ে বাজি ধরবেন?"

মুখার্জি বাবু তো কৌতূহলের সাথে বলল, "তোমার যা খুশি"।

রমেন—তবে স্যার, আমি বাজি ধরে বলতে পারি ঘোড়ার কানেও মাকড়সার ঝুল দেখতে পাওয়া যায়।

"কি ওলট পালটা বকছ।"

"স্যার ৫০০ টাকা বাজি"

"ঘোড়ার কানে ঝুল" মুখার্জি বাবু রেগে উঠে বলল, "একি দেওয়াল নাকি যে ঝুল হবে!"—

রমেন আবার হেসে বলল, "স্যার আমি যে বললাম "বাজি"

"ঠিক আছে, তাই হবে"—

ব্যাস তার পরের দিনই রমেন, মুখার্জি বাবুর গাড়িতে, সারা কলকাতা ঘুরিয়ে, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজি স্ট্যাচুর ঘোড়ার কানে ঝুল দেখিয়ে বলল, "স্যার ওই দেখুন।

আরে এতো পাথরের ঘোড়া"—

তাতো জানি স্যার, তবে ঘোড়ার কানে ঝুল—সে পাথরের কি জ্যান্ত, তা আমি বলিনি। টাকা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন, না পরে দেবেন?"

স্যার আর কি করে, পকেট থেকে টাকা বার করে দিতে হল।

ঘটনাটা তার পরের দিন সারা কারখানা রটে গেল। শুনে বড় বাবু মুখার্জিকে ডেকে বলল, 'আরে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।'

'স্যার অসম্ভব ওকে হারাতে পারবেন না স্যার'

'আমি কি তোমার মত পাঠা, কালকে পাঠিয়ে দেবেন'

যাক, পরের দিন অরুণ বড় বাবুর ঘরে ঢুকে বলল, 'স্যার বাজি ধরবেন। তাহলে আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনার দাড়িতে ঢাকা গালে ব্রন আছে। বড়বাবু তার দাড়িকে ভালবাসত, তাই রেগে ওঠে, 'আমার গাল আমি জানতে পারলাম না তুমি জানবে?'

'স্যার দাড়ি কেটে আমাকে দেখিয়ে দিন, তাহলেই তো ৫০০ টাকা পেয়ে যাবেন।' শুনে খুশি হয়ে স্যার কাছের সেলুনে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে দেখিয়ে দিলো যে তার গালে একটাও ব্রন নেই, বড়বাবু হাসিতে গদগদ হয়ে দৌড়ে মুখার্জি বাবুর কাছে দাঁড়াতেই, মুখার্জি বাবু প্রায় চিৎকার করে ওঠে বলে উঠল, 'স্যার আপনার দাড়ি!'

আরে ওই তো ব্যাপার, বলে সব ঘটনা খুলে বললেন। ছোট বাবুর তখন অবস্থা খুবই খারাপ তা দেখে বড় বাবু রেগে বলল, 'কি হলো, তুমি যেন খুব দুঃখ পেলে মনে হচ্ছে?'

শুধু দুঃখ স্যার, ও যে আজই সকালে আমার কাছে বজি ধরে গেছে। যে আপনার সখের দাড়ি ও কেটে দেবে। স্যার স্যার—এক লাখ টাকা বাজি ছিল স্যার। আ-মার-এক লাখ টাকা গেল। ওরে কি লোকরে বাবা-স্যার, এখনও বলবেন আনন্দ করতে!' ●

# মজার ম্যাজিক

বি কুমার

ম্যাজিক

**ছোট বেলায় দেখেছি, পত্র-পত্রিকায় ম্যাজিক শেখাতে গিয়ে দেশ বিখ্যাত যাত্বকররা ম্যাজিকের আসল সহজ কৌশলটা গোপন করে শিক্ষার্থীকে কঠিন ও দুরুহ সব কৌশল শিখিয়ে দেন।**

**তাই এই পত্রিকাতে চেষ্টা করেছি, শিক্ষার্থী ম্যাজিকের আসল কৌশলটা শিখে দর্শকদের আনন্দ দান করুক ও কোন বিপদের সম্মুখীন না হোক।**

ছোট বন্ধুরা ম্যাজিকের কথাটা শুনলেই মনে হয় মন্ত্র কিংবা সম্মোহনের সাহায্যে ঘটানো অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা। যেমন ধর যাত্বকর একটি মেয়েকে টেবিলে শুইয়ে তাকে হিপ্নোটিজিম করে ঘুম পাড়ালেন। ( আসলে তিনি হিপ্নোটিজিমের অভিনয় করলেন, ও মেয়েটি নিজের ইচ্ছাতেই চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করল ) ও একটা চাদর ঢাকা দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন পরক্ষণে চাদরটি টান মারতেই দেখা গেল মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখানে কিন্তু যাত্বকর মন্ত্র কিংবা হিপ্নোটিজিম কোন কিছুই করলেন না শুধু তিনি যা প্রয়োগ করেছেন তা হল ম্যাজিকের কৌশল। মনে রাখবে ম্যাজিক মাত্রেই কৌশলের সাহায্যে দেখানো হয় তা সে যত অদ্ভুত খেলাই হোক না কেন।

ম্যাজিককে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় যেমন হাত সাফাইয়ের সাহায্যে ছোট খেলা, বৈঠকি খেলা ও ও মঞ্চের খেলা। এখানে তোমাদের হাত সাফাই ও বৈঠকি খেলার একটি করে ম্যাজিক শেখাবো।

প্রথমে হাতে সাফাইয়ের খেলা দিয়ে শুরু করছি যাত্বকর এক টাকার একটি কয়েন বাম হাতের তালুর ওপর রাখলেন। সবাই দেখতে পেলেন এক টাকার একটি কয়েন বাম হাতের তালুর ওপর রয়েছে কিন্তু কি আশ্চর্য যাত্বকর হাতটি মুঠো করে পরক্ষণে খুলতেই দেখা গেল সেটি একটি দু টাকার কয়েনের রূপ নিয়েছে যাত্বকর আবার হাতটি মুঠো করলেন ও পরক্ষণে মুঠো খুলে দেখালেন দু টাকাটি আগের এক টাকার রূপ ফিরে পেয়েছে। এরপর তিনি টাকাটি ডান হাতে নিয়ে দর্শকদের দিলেন। সকলে দেখল টাকাটিতে কোন কৌশল নেই। এবার এই খেলা কি করে সম্ভব হল তার গোপন কথাটি তোমাদের চুপিচুপি বলছি। তোমাকে একটি এক টাকা ও একটি দু টাকার কয়েন নিতে হবে এরপর টাকা দুটির যে যে দিকে এক ও দুই লেখা আছে তার উল্টো দিকে ফাইল দিয়ে অর্ধেকটা ঘষে ফেলতে হবে। এরপর দুটি টাকার ঘষা দিকে আঠা লাগিয়ে দুটি টাকাকে জুড়ে ফেলতে হবে। এতে টাকা দুটিকে একটি বলেই মনে হবে। খেলা

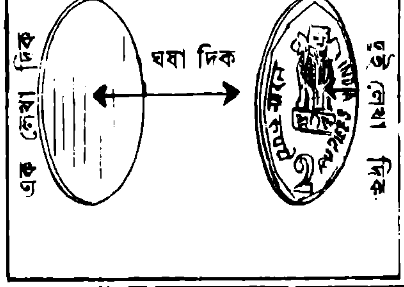


দেখাবার আগে আরেকটি কৌশলহীন টাকার কয়েন প্যান্টের ডান পকেটে লুকিয়ে রাখতে হবে। খেলা দেখাবার সময় কৌশল করা টাকার এক লেখা দিকটি বাম হাতের তালুর উপর রাখতে হবে যাতে সবাই দেখতে পায়। এর পরে হাতে মুঠো করে সেই অবস্থাতেই টাকাটি উল্টে দুই লেখা দিকটি ওপরে আনতে হবে। খেলার শেষ মুহূর্তে দু টাকাটি আবার যখন এক টাকা হতে চলেছে দর্শক তখন তাই দেখতেই ব্যস্ত এই ফাঁকে সাবধানে ডান পকেটের এক টাকার কয়েনটি নিয়ে ডান হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখতে হবে। খেলার

এই ভাবে হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখাকে পামিং করা বলে।

শেষে বাঁ হাত মুঠো করে ডান হাতের মুঠোর সাথে লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের মুঠো খুলে টাকাটি ডান হাতে রাখার অভিনয় করতে হবে তখন ডান হাতে রাখা কৌশল শূন্য টাকাটি দেখে দর্শক সেই টাকাটিকে বাম হাতের টাকাটি বলেই মনে করবে। অবাক হয়ে দর্শক যখন টাকাটি দেখতে ব্যস্ত

এই অবসরে বাঁ হাতের টাকাটি প্যান্টের বাঁ পকেটে ফেলে দিলেই তোমার কাজ শেষ। এদিকে টাকাতে কোন কারচুপি না পেয়ে সকলে ভাববে হয়তো তুমি সত্যি মন্ত্র জান, তাই না? টাকার খেলাটি শিখতে পেরে নিশ্চয়ই তোমরা খুব খুশি হয়েছো।

এসো, এবার তোমাদের একটি বৈঠকি খেলা শেখাই। যাদুকর একটি দু মুখ খোলা টিনের চোঙ নিয়ে সবাইকে দেখালেন চোঙটির একদিক দিয়ে তাকালে অন্য প্রান্ত দিয়ে বাইরের সব কিছুই দেখা যাচ্ছে এবং চোংটি সত্যিই খালি। এরপর যাদুকর চোঙটির দুই

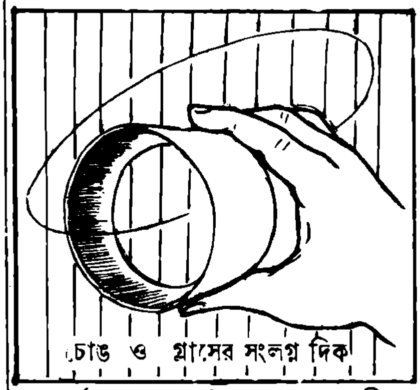


মুখে দুটি পাতলা ঘুড়ির কাগজ লাগিয়ে গাডার দিকে আটকে দিলেন এরপর যা ঘটলো সত্যিই অবাক হবার মতো। যাদুকর চোঙটির একদিকের কাগজে হাতের একটি আঙুল দিয়ে ফুটো করে সেই ফুটো দিয়ে বের করে আনতে লাগলেন রঙিন ফিতে, কাগজের ফুল বিস্কুট, লজেন্স, রুমাল আরও অনেক কিছু। খেলার শেষে যাদুকর চোঙটির দুপ্রান্তের কাগজ খুলে ফেললেন ও সবাইকে চোঙটি তুলে ধরে দেখালেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল চোংটি আগের মতই খালি ও অপর প্রান্ত দিয়ে বাইরের সব কিছুই ভালো দেখা যাচ্ছে। এই খেলাটির কথা শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই খেলাটি শিখতে ইচ্ছা করছে তবে শোন এর আসল কৌশলটি বলছি। তোমাদের যা করতে হবে তা হল একটি দু মুখ খোলা পাউডারের টিন যোগাড় করতে হবে। পাউডারের

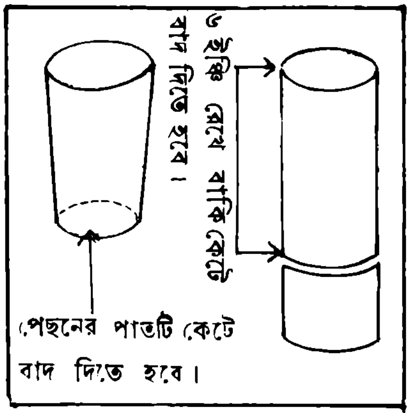


টিনটি ৬ ইঞ্চি রেখে বাকি টুকু কেটে বাদ দিতে হবে। এরপর একটি গ্লাস জোগাড় করতে হবে। গ্লাসটির পেছনের পাতটি কেটে বাদ দিতে হবে। এই গ্লাসের মুখের ব্যাস পাউডারের চোঙটির ব্যাসের থেকে ততটুকুই ছোট হওয়া প্রয়োজন যাতে গ্লাসটি চোঙটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে গ্লাসটির মুখ ও চোঙটির মুখ সামনে থাকে। এরপর যেদিকে গ্লাস এবং এই চোঙটির মুখ আটকে আছে ঠিক তার উল্টোদিকে গ্লাস এবং চোঙটির মধ্যে অনেক খালি জায়গা

এই জায়গাটুকুতেই বিস্কুট, লজেন্স, রুমাল প্রভৃতি রাখা হয়।

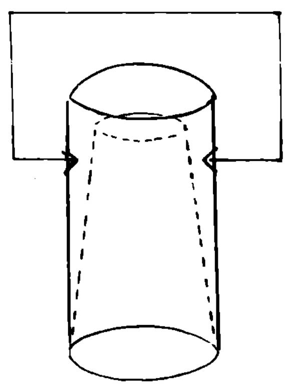

পাওয়া যায়। এই জায়গাটুকুতেই বিস্কুট, লজেন্স, রুমাল প্রভৃতি রাখা হয়। কিন্তু যেদিকে গ্লাস এবং চোঙটির মুখ আটকে আছে সেদিক থেকে দেখলে মনে হয় চোঙটি খালি। চোংটির মধ্যে যে কৌশল আছে তা বোঝা যায় না। খেলা দেখাবার আগে গ্লাস এবং চোঙের ফাঁকটুকুতে প্রয়োজন মতো জিনিস রাখতে হয়। এরপর খেলা দেখাবার সময় গ্লাস এবং চোঙের সংলগ্ন দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে দেখাতে হয় যে চোঙটি খালি এরপর পাতলা কাগজ দিয়ে দুদিকের মুখ গাডার দিয়ে আটকে

ফেলতে হয় ও কাগজের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ফুটো করে গোপন জায়গা থেকে রুমাল, প্রভৃতি জিনিসগুলি বার করে আনতে হয়। খেলার শেষে দুদিকের কাগজ খুলে প্রথমবারের মতই চোঙ ও গ্লাসের সংলগ্ন দিকটাই দর্শকদের দেখাতে হয়। মনে রেখো ম্যাজিক প্রথমে একটু অভ্যাস করে তার পরেই দেখানো উচিত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যাস করলে সব থেকে ভাল হয়। কারণ এতে নিজের ভুলগুলি নিজেই ধরতে পারা যায়। ●

# বিচিত্র দুনিয়া

## উটপাখির লাথি

আফ্রিকার নামকরা পাখি অস্ট্রিচ (Ostrich) এরা উড়তে পারে না তবে শক্তিশালী লম্বা দুটো পায়ে ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ মাইল বেগে দৌড়তে পারে। শত্রুপক্ষের কবল থেকে যখন রেহাই পাবার আর কোন উপায় থাকে না, তখন ওই প্রিয় পা দুটোই হয় ওর আত্মরক্ষার অস্ত্র। শত্রুকে লক্ষ্য করে চালায় দমাদম লাথি। উটপাখির পায়ের লাথি ঘোড়ার খুরের চাঁটের চেয়েও জোরাল।

## বৃহত্তম উভচর

আফ্রিকার ক্যামেরুন অঞ্চলে একরকমের ব্যাঙ পাওয়া যায়, যার নাম 'রাক্ষুসে ব্যাঙ' (Giant frog)। উভচর প্রাণীদের মধ্যে এরা বৃহত্তম। এরা লম্বায় হয়ে থাকে প্রায় ৬১ সেমি এবং ওজনে প্রায় ৬ কিলোগ্রাম।

## ক্ষুদ্রতম ব্যাঙ

কিউবাতে একধরনের ব্যাঙ পাওয়া যায়, যাদের দৈর্ঘ্য মাত্র ১০ মিমি। এদের নাম 'অ্যারো পয়জন ফ্রগ, (Arrow poison frog)। এদের দেহ থেকে এক রকমের বিষ নির্গত হয়। এককালে কিউবার লোকেরা এই বিষ তীরের ডগায় লাগিয়ে ব্যবহার করত।

## জলপান করে না

পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার খুবই প্রিয় স্তন্যপায়ী 'কোয়ালা' (Koala)। জলকে আমরা বলি জীবন। অথচ এই কোয়ালারা কখনোই জলপান করে না। এরা বাস করে ইউক্যালিপটাস গাছের ডালে ডালে, আর এই ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা খেয়েই পেট ভরায় ও জলের তেষ্টা মেটায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, ইউক্যালিপটাসের জল ধারণ ক্ষমতা প্রচুর।

বিকাশকান্তি সাহা

## বৃহত্তম সজীব বস্তু

সজীব উদ্ভিদ বা প্রাণীর সংখ্যা পৃথিবীতে খুবে একটা কম নয়। কিন্তু এদের মধ্যে আয়তনে প্রকাণ্ড আর বয়সেও বিশাল কারা? কেউ হয়তো বলবে তিমি মাছ আবার কেউ কেউ বলবে তিমি নয় হাতি। এদের মধ্যে কোনটাই সঠিক হল না। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি জাতীয় পার্কে সিকোয়া গাছ নামে এক ধরনের গাছের সন্ধান পাওয়া

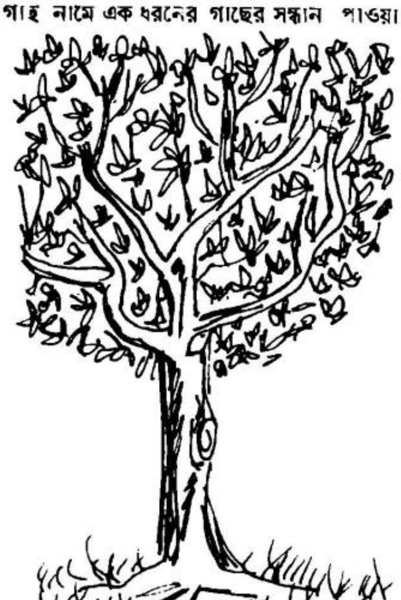

গেছে, যার বয়স উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় চার হাজার বৎসর। নাম 'সিকোয়া জাতীয় পার্ক'"। গাছগুলির উচ্চতা প্রায় তিনশো ফুট। আয়তনে এতই বিশাল যে একটি গাছের কাঠ থেকেই যে পরিমাণ দেশলাই কাঠি তৈরি হবে তাতে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে একটি করে কাঠি উপহার দেওয়া যাবে।

এই সিকোয়া গাছ নিয়ে অনেক গল্প কথা আছে। ভাবতেও অবাক লাগে যে ধর্মযাজক মোড়োস ছেলেবেলায় যখন নীল নদীর ধারে বসে নুড়ি নিয়ে আপন মনে খেলা করতেন সেইসময়ও এই গাছগুলি পৃথিবীতে ছিল। এই গাছের ডাল এখনকার আদিবাসীরা তাবিজ করে হাতে পরে। ওদের ধারণা সিকোয়া ভাগা শরীরে থাকলে কোন বিপদ এমন কি কোন অশরীরী আত্মাও ভর করতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

## একটা গাছের দাম

একটা গাছের আর কত দাম হতে পারে? বড় জোর কয়েক হাজার টাকা। উহু মোটেই নয়। সম্প্রতি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ টি এম দাস গাছের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে খাতায় কলমে এক হিসেব কষে ফেলেছেন যা কিনা বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি বলেছেন, ৫০ বছর বয়সী একটা গাছের দাম ১৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ঐ গাছের তৈরি অক্সিজেনের দাম আড়াই লাখ টাকা, জীবজন্তুকে দেয় প্রোটিনের দাম কুড়ি হাজার টাকা, মাটির ক্ষয়রোধ ও উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আড়াই লাখ টাকা, জলের আবর্তনচক্র ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে ৩ লাখ টাকা, পাখি পোকামাকড়, জীবনচক্র ও ছোট খাট উদ্ভিদের আশ্রয়ে আড়াই লাখ টাকা আবহাওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণে ৫ লাখ টাকা। ভাবতে অবাক লাগছে, তাই না?

অশেষ রায়

## বাসা বানায় যে সাপ

কোন সাপই নিজের বাসা নিজে বানাতে পারে না। ইঁদুরের গর্ত, ইঁটের পাঁজা দালানের ফাটল ইত্যাদি জায়গাই এরা আস্তানা হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু শংখচূড়ই (King Cobra) বোধ হয় পৃথিবীর একমাত্র সাপ যে নিজের বাসা নিজে বানাতে পারে। পাতা, খড়কুটো ইত্যাদিই এদের বাসা তৈরির সরঞ্জাম। তবে এই বাসা বানানোর দায়িত্ব পুরোপুরিই মেয়ে শংখচূড়ের। বাস বিশেষতঃ পাহাড়ী এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বাঁকুড়া পুরুলিয়া—এমন কি সুন্দরবনেও শংখচূড় আছে।

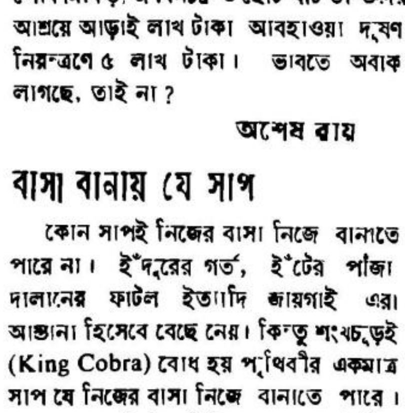

খুট খুট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ভোম্বলের। ঘরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ছে না তার। কিছুক্ষণ ওঁৎ পেতে শুয়ে রইল সে। শঙ্কা আর উৎকণ্ঠায় কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। প্রথম প্রথম যতটা অন্ধকার লাগছিল এখন ততটা লাগছে না। বাইরে দশমীর চাঁদ আকাশে। তার ফুটফুটে রূপালী আলো বেড়ার ফাঁক ফোঁক দিয়ে ফালি ফালি এসে পড়েছে ঘরে। হঠাৎ ভোম্বলের নজর চলে গেল দূরে। ওখানে একটা দরজা খোলা। উধম হাঁ-করা। তার পাল্লাদুটি ঘুট ঘুট শব্দ তুলে নড়ছে বাতাসে।

এমনিতে ভোম্বল খুব সাহসী। তার উপর ক্যারাটে জানে। তাই দুনিয়ার কোন কিছুতেই তোয়াক্কা করে না সে! ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভোম্বল। চুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সন্তর্পনে এগিয়ে গেল খোলা দরজার দিকে।

দরজার কাছে যেতেই তার নাকে ভেসে এল একটা বিশ্রী গন্ধ। ঘরের মেঝেটাও কেমন যেন স্যাঁৎসেঁতে। হঠাৎ পায়ের নীচে নরম কাদার মত কিছু পড়তেই ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠল ভোম্বলের সারা শরীর। নিশ্চয়ই কোন নোংরার উপরে পা পড়েছে তার। বিরক্তিতে কুঁচকে গেল তার জোড়া ভুরু।

আচমকা পিছন দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল ভোম্বল। দেখে ছায়ামূর্তির মত একটা ঠ্যাঙাড়ে লোক গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভোম্বল ভাবল নিশ্চয়ই লোকটা চোর। তার কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঘরে ঢুকে পড়েছে সে লোকটার দিকে তাকিয়ে ভোম্বল চড়া স্বরে বলল, কে, কে

ওখানে।

সামনের দিক থেকে আসা ঠ্যাঙাড়ে লোকটার মুখে যেন কুলুপ আঁটা। কোন সাড়া শব্দ না করে গদাই চালে এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। ভোম্বল অধৈর্য হয়ে আবার ধমক দিয়ে বলল, খবরদার, কথা না বলে আর এক পাও এগিও না।

তবু সেই রহস্যময় লোকটা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। তাই দেখে ভোম্বল আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে নিল নিজেকে। ও জানে শত্রু বশে আনতে হলে প্রথমেই তাকে আক্রমণ করে আঘাত হানতে হবে প্রচণ্ড। তাই ঘুষি পাকিয়ে চুপচাপ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভোম্বল। আর একটু এগোলেই ওর দাবনায় ষণ্ডা-মার্কা একটা ঘুষি চালিয়ে দেবে সে।

হঠাৎ ঠাঙাড়ে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল পিত্তি জ্বালা একটা ধূর্ত হাসির রেখা মুখে এঁকে খুব শান্ত স্বরে বলল, বাবুজী, আপনি ঘুষি পাকিয়ে আছেন কেন? হামাকে মারবেন বুঝি?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভোম্বল বলল, তবে কি তোমার মত চোরকে বসে বসে ধূপ-ধুনা দিয়ে পূজো করবো?

পূজোর কথা শুনে সেই ঠাঙাড়ে লোকটা ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে বলল খবরদার, ওই উজো উজো নামটা হামার ধরে একদম লিবেন না। লিলে আপনার জিব হামি উপড়ে ফেলব। আর আপনাকে জংঘনে পাঠিয়ে দিব। সহি বাত বলে দিলাম।

কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ঠাঙাড়ে লোকটার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে ভোম্বল বলল, জংঘন! সে আবার কোন স্বর্গ।

লোকটা শকুনি দৃষ্টি মেলে ভোম্বলের

দিকে তাকিয়ে ঘ্যানঘ্যানে গলায়, বলল, উটা স্বর্গ না। উটা মর্গ। প্রেতাত্মার মর্গ। হামরা সে সব বেয়াড়া আদমীকো ঘড় মটকে রক্ত চুষে খাই উসকো ফাজিল প্রেতাত্মাকে শাস্তি দিতে জংঘনে পাঠিয়ে দি। উখানে উহাদের এক পায়ের উপর চৌদ্দ বছর দাঁড়িয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হোবে। আহার নিদ্রা কুছু হোবে না।

কথাটা শুনে চমকে উঠল ভোম্বল। তবে কি ঠ্যাঙাড়ে লোকটা ভূত। সে কথা মনে হতেই থরথর করে কেঁপে উঠল তার শান্ত বুক বোধশক্তি হারিয়ে স্থানুর মত দাড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভয় পেলে ভূতেরা নাকি পেয়ে বসে। তাকে নিয়ে পুতুলের মত খেলা করে ভোম্বল তা জানে। তাই মানুষবেশি বিহারী ভূতটাকে কোন আমল না দিয়ে ভোম্বল নির্ভীক স্বরে বলল, চৌদ্দ বছর কেন? শ্রীরামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠানো হয়েছিল তাই?

রাম নাম শুনে আঁৎকে উঠে বিহারী ভূতটা কয়েক পা পিছিয়ে গেল সাঁ করে। তারপর কটমট করে ভোম্বলের মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে গলায় বলল, তুই তো দেখছি বড় বিটকিলে আদমী আছিস্। আজে বাজে অধর্মের নাম শুনাস্। দাঁড়া এক্ষুণি তোর সাধের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খাব। দেখবি হামার আসলি রূপ। বলেই সে এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের রূপ নিয়ে তার দিকে গুটিগুটি এগিয়ে আসতে লাগল দুহাত বাড়িয়ে।

ওর ওই বিকট মূর্তি দেখে ভয়ে থর-থর করে কেঁপে উঠল ভোম্বল। সে চোখ বুজে রাম নাম জপ করতে লাগল ক্রমাগত। ভোম্বলের মুখে রাম নাম শুনে বিহারী ভূতটার পিলে গেল চমকে। সে মুহূর্তে পিছন ঘুরে পাঁই পাঁই করে দিল ছুট। হঠাৎ ঘরের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ঝড়। কারা যেন দুমদাম পা ফেলে ছোটাছুটি করতে লাগল তার চারপাশে। ঠাস্ ঠাস্ করে খুলে গেল ঘরের বন্ধ দরজা। ঝনঝন্ করে ভেঙে পড়ল একদিকের টিনের বেড়া।

বেশ কিছুক্ষণ পর ভোম্বল চোখ মেলে দেখল ঘর ফাঁকা। বিহারী ভূতটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে যেন কর্পূরের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে বাতাসে। ভূত তাড়ানো মন্ত্রে সাহস দপ্ করে বেড়ে গেল দ্বিগুণ। ভোম্বল ওইখানে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে ঠাঙাড়ে ভূতের খোঁজ করতে লাগল চারিদিকে।

ভোম্বলকে ওইভাবে খোঁজাখুঁজি করতে দেখে বিহারী ভূতটা সামনের নোংরা আবর্জনার স্তূপ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল গুটি গুটি ভয়ে কাচু মাচু মুখে ভোম্বলের কাছে এসে হাত

জোড় করে বলল, বাবুজী, ওই নামটা আর হামার সামনে বলবেন না। ওই আম আম নামটা শুনলে হামি টুত হয়ে যাব। সে জীবন বড়ো কোষ্টের। আপনি হামাকে যা বলবেন হামি তাই করে দিব। লেকিন ওই অধর্মের নামটা হামাকে আর শুনাবেন না বাবুজী।

বিহারী ভূতের ভয় পাওয়া কাচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ হাসি পাচ্ছিল ভোম্বলের। তবু গাম্ভীর্য বজায় রেখে গম্ভীর গলায় বলল, টুত! সে আবার কোন জন্তু। ভূতেদের নাম বড় বিদঘুটে কিছু বুঝি না।

বিহারী ভূতটি গদগদ হয়ে বলল, টুত জানেন না বাবুজী? ওই যে আপনারা বলেন ভূত-টুত। ওই টুত। ভূত হয়ে অধর্মের নাম শুনলে টুত হয়ে যেতে হয়। টুতেদের জীবন বড়ো কষ্টের বাবুজী। ও জীবন থেকে মুক্তি নেই। হামাকে মাফ করে দিন বাবুজী। হামি দৈত্য সেজেছি। ভয় দেখিয়েছি আবার আপনাকে তুই বলে সম্বোধন করেছি। হামি অন্যায় করেছি। মাফি মাঙি বাবুজী। ওই অধর্মের নামটা শুনিয়ে হামাকে টুত বানিয়ে দিবেন না। বলেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল বিহারী ভূতটা। তার দু'চোখ দিয়ে ঝুপ ঝুপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল মাটিতে।

ভূতের চোখে জল দেখে ভোম্বল অবাক। পিটপিট করে ওর কাটখোট্টা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, থাক এখন কান্নাকাটি বন্ধ কর। ওসব কান্নাফান্না দেখতে ভাল লাগে না। তোর নাম কি বল?

ভূতটা তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে দু-চোখের জল মুছে কাঁদোকাঁদো সুরে বলল, এখোন হামার কোন নাম নেই বাবুজী। লেকিন আগে ছিল যখন হামি আদমী ছিলাম। তখন হামার নাম ছিল রাম অবতার সিং।

ভোম্বল কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বলল, তুই মানুষ থেকে ভূত হলি কি করে বলত শুনি।

কাঁদো কাঁদো সুরে ভিজে গলায় ভূতটা বলল, হামি গরুর গাড়ির তলায় চাপা পড়েছিলাম বাবুজী। রাস্তাসে যাচ্ছিলাম হঠাৎ চাপা পড়ে গেলাম। যমদূত হামার আত্মাকে ঘাড়ে করে নিয়ে গেল যমের বাড়ি। উখানে হামার বিচার হল। যমরাজ বললেন তুই বুড়বক আছিস। গরুর গাড়ির তলায় চাপা পড়েছিস। তোর ভূত হয়ে থাকতে হোবে। সেই থেকে বাবুজী হামি ভূত হয়ে গেলাম। তবে হ্যাঁ বাবুজী, ভূতেরা হামাকে একটা মুক্তির উপায় বাতলে দিল। ওরা বললো হামি যদি একশয় পঁচিশটা আদমীকো ঘাড় মটকে দিয়ে উগাকে ভূত করে দিতে পারি তবে হামি এ জীবন থেকে মুক্তি পাবো। বাবুজী হামার একশয় চব্বিশটা হয়েছিল। ভেবেছিলাম আপনার ঘাড়টা মটকে দিয়ে সেটা পুরিয়ে দিবো। লেকিন হলো না

বাবুজী। উপরন্তু আপনার গোলাম হলাম। কিমন ব্যাপার হোল বাবুজী। হামিভূত হয়ে এখোন মানুষের গোলাম।

কথাটা শুনে শিউরে উঠলো ভোম্বল। তবু মনকে শক্ত করে নিল সে। ইতি মধ্যে তার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। মনে মনে ভাবল বাগে যখন পেয়েছি বিহারী ভূতটাকে। তখন একটু নাচিয়ে ছাড়ি। তারপর ভোরের আলো ফুটলে রাম নাম জপ করতে করতে বাড়ি চলে যাব। তাই ভূতের ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি যা বলব, তুই তাই করবি তো?

ভূতটা খুশিতে গদগদ হয়ে কোদালের মত বত্রিশপাটি দাঁত বের করে বলল. হ্যাঁ বাবুজী। আপনি যা বোলবেন হামি তাই করে দিবো। বোলেন তো মণি মুক্তা দিয়ে হামি আপনার ঘর ভরিয়ে দিবো। লেকিন বাবুজী হামাকে টুত বানিয়ে দিবেন না।

ভোম্বল মশকরা করে গম্ভীর গলায় বলল, শুনেছি ভূত-নৃত্য দেখতে নাকি দারুণ। তুই আমাকে একটা নৃত্য দেখা।

সঙ্গে সঙ্গে বিহারী ভূতটা লকলকে এক হাত জিব বের করে বলল, হে বাবুজী. হামি নাচতে জানি না। ভোম্বল ওকে ভয় দেখিয়ে বলল, তবে তোকে ধর্মের নাম শুনিয়ে এক্ষুনি টুত বানিয়ে দিচ্ছি।

টুত হবার ভয়ে ভূত রাম অবতার সিং নাচতে রাজি হল। ভোম্বলের মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যালফ্যাল গলায় মিনতি করে বাবুজী আপনি একটা গানা ধোরেন।

ভূতকে বসে আনতে পেরে ভোম্বল

খুশিতে টইটম্বুর। মনের সুখে গলা ছেড়ে একটা জব্বর তালের গান ধরল সে। তার গানের তালে তালে বিহারী ভূত রাম অবতার সিং ধেই ধেই করে শুরু করে দিল নাচ। কখনো মানুষ, কখনো কংকাল। কখনো ভূত, কখনো পেতনী। আবার কখনও ভয়ঙ্কর দৈত্য। কখনো সিংহ। কখনো বাঘ কিংবা ভাল্লুক। সে যেন সারা ঘর জুড়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে লণ্ড ভণ্ড করে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিল। তার ওই সব ভয়াল মূর্তি দেখে ভোম্বলের বুক ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। হারিয়ে গেল তার বোধশক্তি। বন্ধ হয়ে গেল মুখের গান। সঙ্গে সঙ্গে ভূত রাম অবতার সিং নাচ থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভোম্বলের কাছে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, বাবুজী গান বন্ধ করলেন কেন? গান্ গান্। হামার মুড্ এসে গেছে ভীষণ।

ভয়ের কথা বিহারী ভূতটার সামনে বোলতে পারছে না ভোম্বল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ। শত চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কোন শব্দ বের করতে পাচ্ছে না। চোখে সব কিছুই ধোঁয়া দেখছে সে। ভূতটা মনে হয় এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মুহূর্তে গুলি খাওয়া বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোম্বলের ঘাড়ে।

কিছু বুঝবার আগেই তার হিম শীতল ভোটকা গন্ধ যুক্ত হাড়ের হাতটা ভোম্বলের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে মুট করে চেপে ধরল তার জীব। এক নিমেষে রূপ পরিবর্তন করে কঙ্কাল হয়ে গেল সে। কি বিভৎস লাগছে তাকে দেখতে। তার ওই উগ্র মূর্তি দেখে ভয়ে শিউরে উঠল ভোম্বল। গোঙানির মত বিকট আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল তার মুখ থেকে।

ভোম্বল সভয়ে তাকিয়ে দেখল টিনের ঘরটা তার নেই। কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। মাথার উপর তারা ভরা মুক্ত আকাশ। চারিদিকে ঝোপ জঙ্গল। পুবের আকাশটা টকটকে লাল। ওখান থেকে কারা যেন গুরু গম্ভীর গলায় বলছে. রাম অবতার সিং তোমার মুক্তি আসন্ন। ওই বেয়াড়া ছোড়াটার ঘড় মটকে দিতে পারলেই তুমি মুক্তি পাবে। চলে আসবে এই উর্দ্ধলোকে।

ভয়ার্ত চোখে ভোম্বল তাকিয়ে দেখে সে যেন এক মহা নরকে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই নরক গুলজার করে তার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে যমদূতের মত অসংখ্য ছায়ামূর্তি দপদপ করে জ্বলছে নিভছে তাদের লোলুপ চোখ। তারা সব উদগ্রীব হয়ে রাম অবতার সিং-এর কঙ্কাল মুখের দিকে তাকিয়ে উগ্র উল্লাস চীৎকার করে বলছে ওই বেয়াড়া ছোকড়াকে ছেড় না। ওকে আমরা চাই। ওকে আমরা ভূত বানিয়ে রাখব সারা জীবন। ওর প্রেতাত্মাকে তুলে দাও আমাদের হাতে। নির্বিচারে ওর ঘাড় মট মট করে মটকে টাটকা রক্ত চুষে খাও।

নিশুতি রাতকে খান্‌খান্ করে সেই ভয়ঙ্কর শব্দ ভোম্বলের চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল বাতাসে মিশে। রাম অবতার সিং এক হাতে ভোম্বলের জিব ধরে পরিত্রাহি টানতে শুরু করে দিল। অন্য হাত চালান করে দিল ঘাড়ের দিকে। একটা হ্যাঁচকা টানে ভোম্বলকে নিয়ে এল বুকের কাছে। আতঙ্কভরা চোখে ওর ভয়াল মুখের দিকে তাকিয়ে ঠক ঠক করে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল ভোম্বল। বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল তার। পা দুটি টলছে। শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। চোখের স্বচ্ছ চাহনি ধীরে ধীরে ঘোলা হয়ে আসছে। গলা ফাটিয়ে প্রাণপণ চিৎকার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বের হল না তার। মৃত্যুর পরম মুহূর্তে বুঝতে পেরে সে তার শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে মুক্তির মন্ত্র রাম রাম বলে চিৎকার করে উঠল তার স্বরে।

হঠাৎ মায়ের ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে গেল ভোম্বলের। ধড়ফড় করে বিছানার উপর উঠে বসল সে। তার বুক তখনও ওঠা নামা করছে দ্রুত তালে। গলা শুকিয়ে কাঠ। দরদর করে ঝরছে ঘাম। পরনের জামা ভিজে জবজবে। তার ওই ভাব দেখে মা মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কিরে ভোম্বল, কি হয়েছে তোর? অমন করছিস কেন তুই? শরীর খারাপ লাগছে?

ভোম্বল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, না, স্বপ্ন দেখছিলাম প্রেত লোকের। ●

# নোবেল পুরস্কার

## কুমার গুপ্ত

পৃথিবীতে বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলতে তোমাদের নিশ্চয়ই নোবেল পুরস্কারের নামই মনে পড়ে, যিনি এই ভারতবর্ষে এই পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র দুজন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সি. ভি রমণ। অবশ্য আর কয়েকজন ভারতীয় এই পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু তাঁরা কেউ বর্তমানে ভারতবর্ষের নাগরিক নন। পৃথিবীতে এমন কয়েকজন স্মরণীয় পুরুষ আছেন যারা এই পুরস্কার পান নি তাদের মধ্যে লিও টলস্টয়, টমাস হার্ডি, ম্যাক্সিম গোর্কি, সমারসেট মম, বের্টোল্ট ব্রেখট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, আবার এমন মানুষও আছেন যিনি এই পুরস্কার গ্রহণ করেন নি. তাঁর নাম জঁা পল সাঁত্রে।

এই পুরস্কার যার নামে চিহ্নিত, তাঁর নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ, ডিনামাইট আবিস্কার করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, সুইডেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Alfred Bernhard Nobel. ১৮৯৬ সালে মৃত্যুর আগে তিনি উইল করেন, সেই উইল অনুযায়ী পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরস্কারের জন্য রেখে গিয়েছিলেন ৯২ লক্ষ ডলার।

রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শারীরতত্ব, শান্তি, সাহিত্য—এই পাঁচটি বিভাগে অসামান্য কৃতিত্ব যারা দেখাতে পারবেন তাদের পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হবে। ১৯৬৭ সালে সুইডিশ ব্যাঙ্ক Riksband-এর তিনশ বছর পুর্তি উপলক্ষে তাদের অর্ঘ্য হিসাবে যুক্ত হল অর্থনীতি বিভাগটি। এই বিভাগে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৬৯ সালে। অন্য বিভাগে পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছিল ১৯০১ সালে, প্রথম পুরস্কার প্রাপক ছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী এক্সরে-র আবিষ্কর্তা উইলিয়াম কনরাড রণ্টজেন।

পুরস্কার দেওয়ার জন্য সুইডিশ আকাদেমীর ১৮ জন সদস্য আছেন। তাছাড়া এই আকাদেমী স্বীকৃত ফ্রান্স, স্পেন, জার্মান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, তারা নাম সুপারিশ করেন। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন আগেকার নোবেল পুরস্কার প্রাপক, পার্লামেন্টের সদস্য, খ্যাতনামা বিচারক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার প্রার্থীর নাম সুপারিশ করতে পারেন। নির্বচিত প্রার্থীকে পুরস্কার দেওয়া হয় ১০ ডিসেম্বর স্টকহোমে। এই দিন নোবেলের জন্মদিন হিসেবে স্মরণীয়। এই উপলক্ষে ৩-১০ ডিসেম্বর পালন করা হয় নোবেল সপ্তাহ।

১৯৮৪ সালে যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন :

অর্থনীতি – ৭১ বছর বয়স্ক Sir Richard Stone পুরস্কার পান। তিনি Cambridge University এর সঙ্গে যুক্ত

চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শরীরতত্ব – এই বছরে তিনজনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। Cambridge-এর British Medical Research Council's Labrotarya সঙ্গে যুক্ত Dr. Cesar Milstein এবং সুইজারল্যাণ্ডের Basel Institute of Immunelogy এর সঙ্গে যুক্ত Dr. Niels K. Jerne এবং Dr. Georges Koehlea পুরস্কার পান।

পদার্থবিদ্যা—ইটালী এবং হল্যাণ্ডের দুজন পদার্থবিদ্যাবিদ Carlo Rubbia এবং Simon Van der Meer যুগ্মভাবে পুরস্কার পান।

রসায়ন—R. Bruce Merrifield এবার পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি নিউইয়র্কের Rockefeller University এর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সাহিত্য—৮৩ বছর বয়স্ক চেক কবি Jaroslav Seifert পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ১৯০১ সালে Prague-এ জন্মগ্রহণ করেন, ১৯০১ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ "City in Tears" প্রকাশিত হয়।

শান্তি—দক্ষিণ আফ্রিকার চার্চ নেতা এবং বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে মত প্রচারক ৫৩ বছর বয়স্ক Bishop Desmond Testu এবার পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি South African council of churches-এর সম্পাদক

পুরস্কারের গল্প বিভাগে বিভিন্ন পুরস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। এ সংখ্যায় নোবেল পুরস্কারের গল্প। আগামী সংখ্যাগুলিতে লেখার সুযোগ তোমরাও পাবে।

# ব্যাঙের ছাতা

অশেষ রায়

বর্ষাকাল এলেই জ্বালা। বৃষ্টি আর কিছুতেই থামে না। ভাগ্যিস কাছে-পিঠে কারা এই ছাতাগুলো খুলে রেখে গিয়েছিল। বাচ্চা-কাচ্চা কোলে পিঠে নিয়ে তাই ঠাণ্ডার হাত থেকে বেঁচে আছি, এই ছাতার তলায় বসে। নইলে সর্দি-কাশির ছাপা পোয়ানই দায় হয়ে পড়ত—আপন মনে কথাগুলো বলে চলেছিল এক মা ব্যাঙ। কিন্তু কথা হলো—কোত্থেকে এল এই ছাতা? কেই বা এর নির্মাতা?

আসলে এরা হল 'ছত্রাক' (Fungi) জাতীয় একরকম উদ্ভিদ। বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে-খড়ের গাদায় পচা বস্তুর উপর এঁদো জায়গায় এদের জন্মাতে দেখা যায়। আর এই সব জায়গা-গুলোই হল ব্যাঙের অবাধ বিচরণভূমি থপ্-থপ্ করে যেতে যেতে খাবারের খোঁজে তাই এদের সাথে দেখা হয়ে যায় ছাতার তলায়। সেই থেকে সাধারণ মানুষ এই ছাতার নাম রেখেছেন ব্যাঙের ছাতা। খড়ের গাদায় বেশী জন্মায় বলে কেউ কেউ বলেন 'পল ছাতু' আবার কেউ কেউ শুধু ছাতু' বলেই চেনেন এই ব্যাঙের ছাতাকে। অবশ্য কেতাবী ঢং এ ইংরেজী কায়দায় এর বহুল প্রচলিত নাম "মাশরুম" (Mushroom)। বহু প্রজাতি এদের। তবে সবাইকেই ছাতার মতো দেখতে। জন্মলগ্নের শুরুতে প্রায় প্রত্যেকের চেহারাই থাকে ফোলানো বলের মতো এরা উদ্ভিদ হলে কি হবে, এদের দেহে ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক কণাই নেই। তাহলে এবার প্রশ্ন থাকে—কিভাবে এরা খাবার জোগায়? 'না এদের খাবারের জন্য মোটেই নির্ভর করতে হয় না সূর্যরশ্মির উপর। নিজেদের বাসভূমি থেকেই প্রয়োজনীয় খাদ্যরস 'মাইসিলিয়াম' (Mycelium) নামক একরকমের অনুসূত্র দিয়ে শোষণ করে থাকে।

বিকল্প খাবারের খোঁজে আমরা যখন হন্যে হয়ে ঘুরছি, ঠিক সেই মুহূর্তে মাশরুমের খাদ্যমূল্য অনেক। দেখা গেছে, মাশরুমের আলু, বাঁধাকপি ইত্যাদি থেকে দ্বিগুণ : টমেটো গাজরের থেকে চারগুণ এবং কমলালেবুর থেকে ছয়গুণ বেশী প্রোটিন আছে। মাশরুমে খনিজ লবণও প্রচুর পরিমাণে আছে, এমনকি কিছু তরিতরকারীর চেয়েও বেশী। লোহা, তামা, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম লবণই বিশেষতঃ এদের দেহে বেশী পরিমাণে থাকে। মাশরুমে ভিটামিন বি ও ডি-এর পরিমাণও বেশ। তবে সব মাশরুমই খাওয়া চলে না। প্রকৃতিগত ভিত্তিতে এরা দু'রকমের হয়ে থাকে। এক, বিষযুক্ত; দুই, বিষহীন। বিষহীণ মাশরুমই খাবার হিসেবে ব্যবহার করা চলে। বিষযুক্ত মাশরুম খেলে স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

এখন কথা হল—কি করে চেনা যাবে বিষযুক্ত মাশরুমকে হ্যাঁ, বিষযুক্ত মাশরুম চেনার কয়েকটা প্রধান উপায়ের কথাই বলছি।

১,মাশরুম থেকে যদি কটুগন্ধ পাওয়া যায়, তবে ধরে নেওয়া যায় তা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

২, মাশরুম কাটার সময় যদি এর দেহের রং-এর কোন পরিবর্তন হয়, বিশেষত ঘন নীল রং হয়ে যায় তবে তা কখনোই খাওয়া উচিত নয়।

৩, মাশরুম কাটার পর যদি দুধের মতো সাদা পদার্থ নিঃসৃত হয় তবে তা সাথে সাথে পরিত্যাগ করা উচিত।

৪, কিছু কিছু মাশরুম আছে যাদের মূলের দিকটায় একরকমের 'ক্যাপ' থাকে।

# সহজ প্রজেক্টর

## শুভ্র দত্ত

সহজ প্রজেক্টর তৈরি করতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলি যে কোন ইলেকট্রিকালস্-এর দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে।

সহজ প্রজেক্টরে ব্যবহৃত লেন্স পাওয়া যাবে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটের যে কোন রেডিমেড লেন্সের দোকানে।

প্রজেক্টর যন্ত্রটির সঙ্গে তোমরা অনেকেই হয়ত পরিচিত। সাধারণ প্রজেক্টরে স্বচ্ছ ছবি বা ট্রান্সপারেন্সি প্রজেকশন করে অর্থাৎ ছোট ছবি বড় করে পর্দায় ফেলে দেখানো হয়। এখানে যে প্রজেক্টর তৈরির পদ্ধতি দেওয়া হলো তার সাহায্যে অস্বচ্ছ সমতল ছবি, যেমন সাধারণ ফটোগ্রাফ বা কাগজে আঁকা ছবি দেওয়ালে বড় করে ফেলে দেখাতে পারবে।

প্রজেক্টর বানাবার জন্য প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো যোগাড় করে ফেলে নিচের তালিকা অনুযায়ী।

(ক) একটি ১১ সেমি × ১৮ সেমি × ১৮ সেমি শক্ত বোর্ডের বাক্স। নিজে কার্ডবোর্ড কেটে তৈরি করে নিতে পারো।

(খ) একটি উভ উত্তল (Bi-convex) লেন্স্ যার পাওয়ার + ১০। সাধারণ ছোটো সাইজের ম্যাগনিফাইং গ্লাস কিনে তার লেন্স্টা হাতল থেকে খুলে নিতে পারো; তাতেই কাজ চলবে।

(গ) ৬০ ওয়াট, ২২০ ভোল্টের দুটি বাল্ব। স্বচ্ছ বা ঘোলাটে যে কোনো রকম বাল্বের কাজ চলবে।

(ঘ) দুটি বাল্বের হোল্ডার, একটি প্লাগ এবং কিছু ইলেকট্রিক তার।

(ঙ) কিছু কার্ডবোর্ড এবং কাঁচি, আঠা ইত্যাদি সরঞ্জাম।

এবার কাজ শুরু করে দাও।

প্রথমে কার্ডবোর্ড দিয়ে লেন্স্‌কে ঘিরে একটি চোঙা আকৃতির লেন্স্ হোল্ডার তৈরি করে ফেলো। (১নং ছবি। এর দৈর্ঘ্য হবে ২ ইঞ্চি, এবং তার মাঝামাঝি জায়গায় লেন্সটিকে শক্ত করে বসাতে হবে।

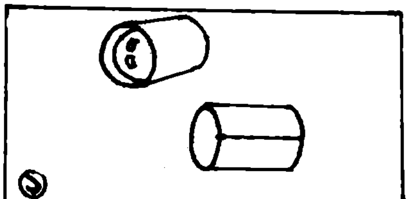

১

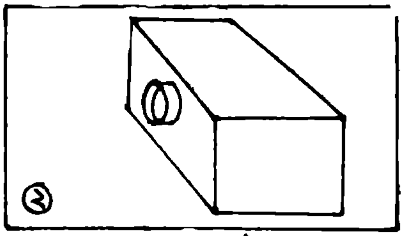

২

এরপর বাক্সের একটি ১৮ সেমি × ১৮ সেমি দিকে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি গোল গর্ত করে ফেলো যার ভিতর লেন্স হোল্ডারটি বসতে পারে। লেন্স সহ লেন্স হোল্ডারটি যাতে সামনে পিছনে নড়াচড়া করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখো। ( ২নং ছবি )।

এবার বাক্সের ভিতর লেন্সের দুপাশে বাল্ব দুটিকে বসাবার ব্যবস্থা করো। উপর দিয়ে ঠিকমত গোল করে কেটে বাল্ব হোল্ডার দুটিকে ঢোকাতে হবে। ( ৩নং ছবি )।

বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে কানেকশন করো, ছবিতে যেভাবে দেখানো রয়েছে সেভাবে। ( ৪নং ছবি )

তারের কোনো অংশ খোলা থাকলে ইনস্যুলেটিং টেপ দিয়ে জড়িয়ে দাও। বাল্ব থেকে আলো যেন সরাসরি লেন্সের উপর না পড়ে। ছোট কার্ডবোর্ডের টুকরো কেটে বাক্সের ভিতর বাল্বের পাশে আটকে এই আলো বন্ধ করে দাও।

তারপর বাক্সের উপরে একপাশ দিয়ে কেটে লম্বা ছিদ্র করে দাও ৫নং ছবির মতো করে। যে ছবি তুমি প্রজেকশন করতে চাও, তা এই ছিদ্র দিয়েই বাক্সের ভিতর ঢোকাবে।

এখন তোমার প্রজেক্টর তৈরির কাজ শেষ। এবার অন্ধকার ঘরে প্রজেক্টর বাক্সের ভিতরের আলো জ্বেলে দাও। প্রজেক্টরটিকে সাদা দেওয়ালের থেকে কয়েক ফিট দূরে রাখো। লেন্সের মুখ দেওয়ালের দিকে ঘোরানো থাকবে। এবার, যে ছবি প্রজেক্ট করতে চাও, তা ঐভাবে ফাঁক দিয়ে উল্টো করে ( অর্থাৎ মাথা নিচের দিকে করে ) বাক্সের ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। ছবি লেন্সের দিকে মুখ করে থাকবে। এবার দেখ দেওয়ালে ঐ ছবিটির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে অনেক বড় আকারে। লেন্স হোল্ডারটি সামান্য সামনে পিছনে করলে প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

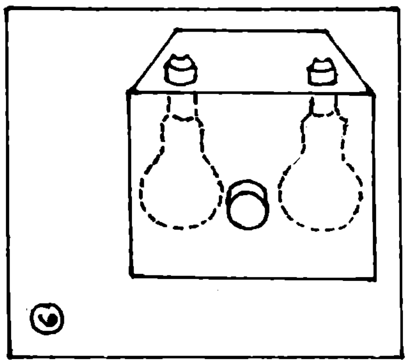

৩

প্রজেক্টর তৈরীর ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রেখো। যে কোনো পাওয়ারের লেন্স সুবিধামত ব্যবহার করতে পারো। তবে সবক্ষেত্রেই উপযুক্ত বাক্সের দৈর্ঘ্য হবে লেন্সের ফোকাল লেংথের কিছুটা বেশী। লেন্সের সাহায্যে দূরের বস্তুর ছবি পর্দায় ফেললে লেন্স থেকে পর্দার দূরত্ব যা থাকে, তা-ই ঐ লেন্সের ফোকাল লেংথ)।

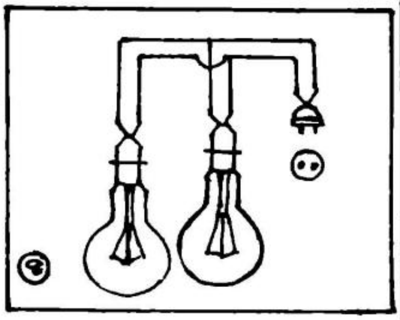


এখানে যে আকারের প্রজেক্ট তৈরীর প্রণালী দেওয়া হয়েছে তার সাহায্যে ৪ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি এর চেয়ে বড় ছবির প্রজেকশন করা অসুবিধাজনক।

তাছাড়া, দেওয়ালে যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়, সেখানে ডানদিক এবং বাঁদিক উল্টো হয়ে যায়। আয়না লাগিয়ে বিশেষভাবে প্রজেক্টর তৈরী করলে অবশ্য এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

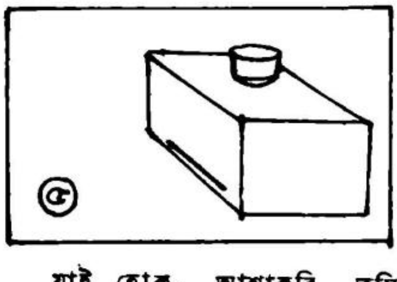


যাই হোক, আশাকরি তুমি তোমার ভাইবোন আর বন্ধুদের নিয়ে মজা করে তোমার নতুন প্রজেক্টরে দেওয়ালে ফেলা ছবি দেখছ।

# বেবুন

আমাদেরই এক পূর্বপুরুষ। নাম এর বেবুন। এমনিতে বেশ শান্তশিষ্ট। তবে ভয় পেলে বা বিরক্ত হলে কিংবা বিপদে পড়লে আর রক্ষে নেই। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বসে শুরু করে দেয় কানফাটা চিৎকার। এরপর শত্রু যদি হাতের কাছেই থাকে তবে তাকে নখ দিয়ে খামচে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে লাগায় প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে শত্রুর হাড়গোড় অনায়াসেই যায় গুঁড়িয়ে। বিপদে পড়লে পালের গোদারাই শত্রুর মুখোমুখি হয়। দলের অন্যান্যরা সেইসময় পালিয়ে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে। বিপদোন্মুখ বেবুনের কানফাটা চিৎকারে নিজের পরিবারের সদস্যরা তো বটেই, বনের অন্য প্রাণীরাও নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। এযেন বনের সংকেত॥

বি. কে. সাহা

# শীতের অতিথি-গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রেব

## সন্দীপ সেন

**শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর গোলার্দ্ধ থেকে নানা ধরনের পাখিরা এসে ভিড় করছে ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে। এদের বেশির ভাগই বোধ হয় হানা দিয়েছে চিড়িয়াখানায়। কত নাম না জানা পাখি, কত রকম তাদের রঙ। সকলের সম্বন্ধে জানাও কারো সম্ভব নয়। তবু এরকমই এক যাযাবর পাখির কথা নিয়ে এই রচনা।**

শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। যাযাবর পাখিরা উত্তর গোলার্ধের দেশগুলি থেকে ভারতবর্ষে অতিথি হিসেবে আসতে শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ আলিপুর চিড়িয়াখানার ঝিলে পৌঁছে গেছে।

এইরকম এক যাযাবর পাখি পডিসিপি ফরমেস বর্গের গ্রেব পরিবারের পাখি গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রেব। যার বৈজ্ঞানিক নাম পডিসেপস ক্রিসটেটাস। সুদূর গ্রেট ব্রিটেনের আয়ারল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের লেক অঞ্চল ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে এরা প্রতি বৎসর উড়ে আসে। চিড়িয়াখানায় এদের খুব কমই দেখা যায়। কারণ এরা কোলাহল পছন্দ করে না। এরা পছন্দ করে অল্পস্রোত যুক্ত জল। নভেম্বর পনের তারিখ থেকে এরা আসতে শুরু করে। থাকে মার্চ মাস পর্যন্ত। এদের ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায় চিল্কার হ্রদে, ময়ূরাক্ষী কংসাবতী, দামোদর নদীতে।

গ্রেব পরিবারের মধ্যে আকৃতিতে সবচেয়ে বড় এরা। দেহকাণ্ড বার ইঞ্চি লম্বা। ওড়ার সময় গলা এবং পা দেহের সঙ্গে এক সরলরেখায় লম্বালম্বি ভাবে রেখে উড়ে। নিচের থেকে তখন পালকের ধপধপে সাদা জমি দেখতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু পিঠের উপরের এবং ডানার পালক ধূসর রং-এর। ঠোঁট খুব চওড়া নয় সূঁচালো এবং হালকা লাল রং-এর। চোখের কালো বর্ডার শেষ হওয়ার পরই একটি সাদা রং এর বলয় চোখের চারপাশে আছে। ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী সময়ে জুলাই পর্যন্ত প্রজনন সময়। এই সময় মাথায় ঝুঁটির মত পালক দেখা যায়। যেন মুকুট পরানো হয়েছে। মাথা এবং গ্রীবার কিছু অংশ পর্যন্ত লাল এবং ময়ূরকণ্ঠি রং এর নরম পালকের আস্তরণ এই সময় পাখিটিকে সাজিয়ে দেয়।

এই পাখিরা সবসময় দলবদ্ধ ভাবে থাকতে ভালবাসে। কমপক্ষে তিন বর্গএকর বিস্তৃতি লেক না হলে সেখানে তারা বসবাস করেনা। লেক বা ঝিলে যেখানে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ আছে সেই সব জায়গা তারা বাসস্থান হিসেবে বেছে নেয়।

পুরুষ এবং স্ত্রী পাখী প্রাক-প্রজনন পূর্ব কোর্টশীপ এ সমান সমান ভূমিকা গ্রহন করে। তারা উভয়ে এই পর্বে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকায়, ঘাড় দোলায়। ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ায়। দেখতে সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। তারা পরস্পরকে বাসা তৈরির সাজ সরঞ্জাম উপহার দেয়। অনেক সময় একজোড়া পাখি অন্য জোড়াকে আক্রমণ করে এবং জলে ছোটাছুটি করে। জলপূর্ণ গর্তর মধ্যেই এরা বাসা বাঁধে জলজ উদ্ভিদ ও কাঠকুটো দিয়ে। বসন্ত এর শেষ দিকে বাচ্চা পাখিদের পি-আয়ুহ, পি-আয়ুহ ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়। গ্রেট ক্রেস্টেড গ্রেব ভাল ডুব সাঁতার দিতে পারে। কিন্তু জলতলে কখনোই একমিনিটের বেশি থাকে না। জলের দশ ফুট গভীর পর্যন্ত এরা অনায়াসে চলে যায়।

খাদ্যের ব্যাপারে এদের কোন বাছবিচার নেই। জলজ আগাছা জলজ পোকা মাকড়, ছোট মাছ, এমনকি ব্যাঙাচি পর্যন্ত খায়। হাঁসেরা ওড়ার সময় যেমন পায়ের উপর ভর দিয়ে প্রথম ওড়া শুরু করে পরে এবং পা গুলিকেই আগে জলে নামায় নামার সময় এরা কিন্তু তা করে না এদের সমস্ত কিছু হয় সোজাসুজি বুকের উপর ভর করে।

বাসা তৈরি হলেও এরা ডিম পাড়ে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাসার চারিদিকে ঝোপ সৃষ্টি হয়ে বাসাটিকে সম্পূর্ণ না ঢেকে ফেলে। স্ত্রী পাখিটি তিন থেকে ছয়টি সাদা লম্বাটে গড়নের ডিম পাড়ে। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই ডিমে তা দেয়। চার সপ্তাহ পরে ডোরা ডোরা পালকযুক্ত বাচ্চা বের হয়। মা বাবা উভয়েই প্রথমে বাচ্চাদের লালন পালন করে। পরবর্তীকালে মা কিছুকাল বাচ্চাদের পিঠে বহন করে। ছয় সপ্তাহ পরে বাচ্চারা নিজেরাই ডুব দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে।

অনেক সময় একই প্রজনন ঋতুতে এরা দুবার বাচ্চার জন্ম দেয়।

মার্চের শেষেই এরা গ্রেট ব্রিটেন অভিমুখে পাড়ি দেয়। নভেম্বরের পনের তারিখ থেকে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এদের গ্রেট ব্রিটেনের কোথাও দেখা যায় না।

# রামজীর এক্কাগাড়ী

## প্রদীপকুমার দত্ত

দুর্ভেদ্য সাহস। অসাধারণ মনোবল ও একনিষ্ঠতা নিয়ে দুটি তরুণ এগিয়ে গিয়েছিলেন সব বাধা তুচ্ছ ক'রে অলৌকিক রহস্যভরা রামজীর এক্কা গাড়ী চ'ড়ে চৌধুরী বাড়ীতে—যাত্রা কি তাদের শুভ হয়েছিল? না, রামজীকে নিয়ে একটি প্রচলিত ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল ঐ দুই তরুণ?

পিপুলবাঘা ষ্টেশনে যখন নামলাম রাত তখন বারোটা। সারা ষ্টেশনে কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। শুধু মানিক আর আমি অন্য কেউ এই ষ্টেশনে নামলো না দেখে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ট্রেনটা আস্তে আস্তে দূরে বহুদূরে মিলিয়ে গেল।

ষ্টেশন থেকে রাস্তায় পা বাড়ালাম। কোথাও কোন গাড়ী চোখে পড়ল না। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক চারিদিক থেকে ভেসে আসছে। অকস্মাৎ একটা রাত জাগা পাখি বিশ্রীভাবে ডেকে উঠল। তখন দুখুরামের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল ওর কথাগুলো। ও তখনই আমায় বলেছিল, যাবেন না বাবুরা। এরকম সময়ে বেরোচ্ছেন যে যখন পৌঁছবেন তখন আর কোন গাড়ী পাবেন না। তারচেয়ে বরং আজকের দিনটা রয়ে গিয়ে কাল সকাল বেলায় যাবেন।

আমি তখন দুখুরামের কথা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম রাত যদি বা হয় তাতে ক্ষতির কি আছে?

ক্ষতির অনেক কিছুই আছে। ওই মুল্লুকে রাতে যেসব অচেনা-অজানা লোক গেছে তাদেরই পড়তে হয়েছে রামজীর এক্কা গাড়ীর পাল্লায়।

রঘুকে বললাম, তবে যে তুমি বললে কোন গাড়ী পাবো না। ঐ এক্কা গাড়ীতে করে যাবো। তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। আমরা ঠিক চলে যাবো।

দুখুরাম বলেছিল, আমি জানি বাবু আপনারা এক রোখা যেখানে যাবেন ঠিক করেন সেখানে যাবেনই। তাই আর বাধা দেবো না। তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। আপনার ওই বাবার বন্ধুর বাড়ী আমি ভালোভাবেই চিনি। আপনার বাবার সাথে আমি অনেকবার গিয়েছি।

তুমি অনেকবার গেছো কিন্তু আমিতো একবারে যাইনি। আর তুমি গায়ে এত জ্বর নিয়ে যাবেই বা কি করে? তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

দুখুরাম বলেছিল, ঠিক আছে আপনারা যান বাবু, তবে এক মিনিট দাড়ান। আমি ছেলেকে ডেকে আনি।

আমি বললাম, কি দরকার? ঠিক আছে। তুমি শোও আমি ডেকে আনছি।

দুখুরামের ছেলে মনু বাড়ির সামনেই মনমরা হয়ে বসেছিল। হয়ত বাবার শরীর খারাপ দেখে। দুখুরামের কাছে এসে বলল, ডাকছিলে বাবা?

দুখুরাম বলল, তোর গলার হারটা খুলে দে। বাবুরা আজকে পিপুলবাসা থেকে রামজীর এক্কা করে চৌধুরী বাড়ীতে যাবে।

মনু কি বুঝল। গলা থেকে লকেট সমেত হারটা খুলে দিল। রঘুও তার গলা থেকে লকেট সমেত হারটা খুলে ফেলল। দুটো লকেটেই যীশুখ্রীষ্টের ক্রস তারপর দুখুরাম এগিয়ে দিয়ে বলল কেউ ভয় দেখায় আপনাদের বা ভয় পান তাহলে লকেটটা বুকে নিয়ে পবিত্র যীশুর নাম স্মরণ করবেন। তাহলে আপনাদের কেউ কিছু করতে পারবে না যে ভয় দেখাবে তখন তাকে আপনাদের কথাতেই চলতে হবে। আপনারা এই হার দুটো দুজনে গলায় পরে নিন।

আমি আর মানিক তাড়াতাড়ি করে গলায় পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি ছিলো বলেই। কিন্তু দুখুরাম যে বলেছিল রামজীর এক্কাগাড়ী ঠিক পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় রামজীর এক্কাগাড়ী?

না দুখুরাম কোন মিথ্যে কথা বলেনি। ভোজবাজির মতো রামজীর এক্কাগাড়ী দেখা মিলল। টং-লং-টং-লং করে শব্দ তুলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। গাড়ীর ভেতর রোগা, কুচকুচে কালো একটা লোক। হাতে একটা চাবুক। অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম। গায়ে বিশ্রী গন্ধ। সে বলল, উঠে পড়ুন বাবুরা। গাড়ীর মধ্যে মানিক আর আমি উঠে বসতেই রামজীর এক্কাগাড়ী চলতে শুরু করল। গাড়ীর মধ্যে একটা কেমন যেন গন্ধ! গা গুলিয়ে ওঠে। জোরে আরো জোরে রামজীর এক্কাগাড়ী ছুটতে শুরু করল। এমন সময় মানিক জিজ্ঞাসা করল, ওঃ রামজী এতক্ষণ তো তুমি গাড়ী চালিয়েই যাচ্ছো। কোথায় যাবো কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না? বলামাত্র নিস্তব্ধ অন্ধকারের সেই নিঝুম রাতে রামজী হাঃ-হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠে বলল, আপনাদের দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনারা চৌধুরী বাড়ী যাচ্ছেন, বলে এসেছেন এখানে। চৌধুরী বাড়ীর এখন কেউ বেঁচে নেই। বাড়ীর সবাইকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে এখন ওই বাড়ীতে তাদের প্রেতাত্মা ঘোরাঘুরি করে। সেখানে গেলে আপনাদের আর রক্ষা থাকবে না।

আমি তখন ভয়ে কাঁপছি। কি করব ভেবে উঠতে পারছি না। এমন সময় মানিক বলল, দেখো রামজী ওই নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না। আমাদের তুমি চৌধুরী বাড়ীতেই নিয়ে চলো। আমি মানিককে বাধা দিয়ে বলি, সেকি বলছিস? আমি ওখানে যাবো না। রামজী যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাওয়া ভালো।

মানিক বলল, না সেখানে যাওয়া মোটেই ভালো নয়। দুখুরামের কথা মনে আছে? দুখুরাম আমাদের কি বলেছিল? রামজী স্রেফ ধাপ্পা দিচ্ছে। চৌধুরী বাড়ীর কেউ মরেনি। আর মরে থাকলেও তোর বাবা নিশ্চয় জানতেন!

মানিকের কথায় চমকে উঠলাম। মনে পড়ে গেল দুখুরামের দেওয়া লকেটের কথা। মানিক রামজীকে বলল, দেখি তুমি আমাদের কি করো? সহসা চোখে পড়ল, সামনে একটা বিরাট খাদ। সেইদিকে রামজীর এক্কাগাড়ী প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। মানিক চেঁচিয়ে উঠে বলল, সর্বনাশ বিজয়, হাতে একদম সময় নেই। বিপদ আমাদের এলো বলে। যীশুর নাম স্মরণ কর বিজয়। হাত দিয়ে বুকে লকেটটা চেপে ধর। ছিঁড়ে পড়ে গেলে ...। কথাগুলো আর শুনতে পেলাম না। অথচ দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। খাদের ঢালে রামজীর এক্কাগাড়ী গড়িয়ে চলেছে। শুধু রামজীর বিরাট অট্টহাসি চারিদিকে

প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তারপর আমি কিছু জানিনা। মানিকের থেকে জানতে পারি। খাদের দিকে রামজীর একাগাড়ী গড়ানোর সময় 'থামো' বলতেই অদ্ভুতভাবে রামজীর একাগাড়ী থেমে যায়। আর তার পরেই মানিক দেখে কোথায় রামজী আর কোথায় বা তার একাগাড়ী। কিছু নেই, আমি খাদটার একটা ঢালে পাথরের পাশে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে ছিলাম। আর মানিকের ? ও অজ্ঞান হয়নি। মানিকও ঢালের পাশে পাথরের গায়ে ঠেস দেওয়া অবস্থায় বসে ছিল।

তারপর বাবার বন্ধুর বাড়ীতে ওই রাতে গিয়ে কে যেন খবর দেয় যে আমরা এখানে পড়ে রয়েছি। আর সেই খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে যায়।

বাবার বন্ধুকে আমরা মেসোমশাই বলি। মেসোমশাই বললেন, আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে রামজী ওই রাস্তায় একাগাড়ী চালাতো। তখন তো আর বাস চালু ছিল না এই রাস্তায়। সবাই তাই গরুগাড়ী আর একাগাড়ীর উপর ভরসা করত। কিন্তু রামজীর একাগাড়ীতে কেউ উঠতে চাইতো না। কারণ লোকটা ভীষণ নেশা করত আর গায়ে ভীষণ গন্ধ ছিল। কিন্তু ভীষণ রাতে রামজীর একাগাড়ী ছাড়া কোন গাড়ীরই দেখা মিলত না ওই মুল্লুকে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে উঠত।

ঐ রকম একদিন রামজীর একা-গাড়ীতে করে একজন আসছিল। লোকটা ভীষণ ভালো ছিল। গ্রামের সবায়ের উপকার করে বেড়াত। লোকটা হোমিওপ্যাথির ডাক্তার ছিল। সবাইকে বিনা ফিতেই চিকিৎসা করত। কারো থেকে পয়সা নিত না। একদিন একজনের বাড়ী রোগী দেখতে গিয়ে রাত হয়ে গিয়েছিল। অনেকটা পথ। তাই বাধ্য হয়ে সেদিন তাকে উঠতে হয়েছিল রামজীর একাগাড়ীতে। কিন্তু রামজীর স্বভাব ভীষণ খারাপ ছিল। অত রাতে যারা যেত তাদেরকে ভয় দেখাত নানারকম ভাবে। যে সব নতুন লোক যেত তারা ভয় পেতো। কিন্তু যারা এ ব্যাপারে জানত তারা বড় একটা ..। শুধু শুনে যেতো।

জ.র একাগাড়ীতে সেই ডাক্তার যাচ্ছে এমন সময় কড়াৎ কড়াৎ করে উঠে শুরু হল বৃষ্টি আর ঝড়। সেইদিন রামজী নেশা করেছিল; আর সেই বৃষ্টিতে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। নেশার ঘোরে রামজী খাদের মধ্যে একাগাড়ী নামিয়ে দিল। সেই খাদে রামজীর একাগাড়ী গড়াতে গড়াতে খাদের মধ্যে পড়ে গেল। সেই ডাক্তার লোকটি ওই ঝড় বৃষ্টির রাতে মারা গেল। রামজীও মারা গেল। কিন্তু এখন রামজীর আর তার একাগাড়ীর দেখা মেলে। তোমরা নতুন লোক দেখে তোমাদের দেখা দেয়। আর সেই লোকটাই বোধহয় মানে সেই ডাক্তার এসে জানিয়ে যায় যে তোমরা ওখানে রয়েছো।

মানিক বলল দেখ বিজয় রামজী নিজে একজন প্রেতাত্মা হয়ে বলল, 'চৌধুরী বাড়ীর এখন কেউ বেঁচে নেই। বাড়ীর সবাইকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে। এখন ওই বাড়ীতে তাদের প্রেতাত্মা ঘোরাঘুরি করে।

শুনে মেশোমশাই হো:-হো: করে হেসে উঠলেন। এই হাসিতে আর ভয় পেলাম না। বরং উল্টো।

---

# খবর

## শিশু সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠান

গত ৬ই জানুয়ারী রবিবার শিশির মঞ্চে বেলা সাড়ে তিনটে থেকে শুরু হয় চতুর্বিংশ নিখিলবঙ্গ শিশুসাহিত্য সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হলেন শিশুসাহিত্য পরিষদ। প্রতিবছরই এই সংস্থা কয়েকজন সাহিত্যিককে এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার দিয়ে থাকেন। সম্মেলনটি দুটি অধিবেশনে ভাগ করা ছিল, প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন শ্রী শৈল চক্রবর্তী। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতির পদে ছিলেন শ্রীনীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। সারাজীবন-ব্যাপী শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ঐদিন ভুবনেশ্বরী পদক পেলেন শ্রী সুকমল দাসগুপ্ত, শ্রী নলিনী দাস। সর্বশ্রেষ্ঠ বই-এর জন্য ফটিকস্মৃতি পদক পেলেন শ্রী নটরাজন এবং শ্রী মল্লিল সেন। শিশুসাহিত্য সংসদ পুরস্কার দেওয়া হয় শ্রী জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী গণেশ পাইন, শ্রী গৌরী ধর্মপাল, এবং শ্রী অহিভূষণ মালিককে। শ্রী মুস্তাফা নাশাদ এবং শ্রী সুধীন্দ্র সরকার কে দেওয়া হয় ধূর্জটি বারীন স্মৃতি পদক। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় শ্রী সলিল লাহিড়ী-কে। সবশেষে শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর স্বর্গতা পত্নী শ্রীমতি বীনা মিত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি পদক তুলে দেন শ্রী বলদেব গোস্বামীর হাতে। এছাড়া ঐদিন উপস্থিত ছিলেন, শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রী অজিতকৃষ্ণ বসু এবং আরো অনেকে। সর্বশ্রী সংকর্ষণ রায়, অতীশ বর্ধন এবং কুঞ্জ বিহারী পাল শিশুসাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন। — চৈতালী ঘোষ

# ডাক টিকিট

## বিশ্বামিত্র কর্মকার

**শখ কত বিচিত্র। তা আবার এক একজনের এক এক রকম। কেউ কুকুর, পাখি পোষো। কেউ বা সারাদিন ছিপ বঁড়শি নিয়ে পুকুর কিংবা ঝিলে বসে রয়েছো এমনি সব নতুন নতুন সখের কথা আমাদের শোনা বা জানা। আমরা এই পাতার মধ্যে দিয়ে সেইসব মজার মজার সখের রাজ্যে ঘুরে বেড়াবো। প্রথম সংখ্যায় ডাকটিকিট এলো। তোমরাও তোমাদের রঙচঙে সখের কথা লিখে পাঠাও না।**

তোমরা অনেকেই স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে ভালবাসো। যাদের সংগ্রহে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশের স্ট্যাম্প আছে তাদের পরিশ্রম অনেক সার্থক। তোমরা যাতে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে আরো উৎসাহ পাও তারজন্য স্ট্যাম্পের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি।

১৮৪০ সালের ৬ই মে ইংলণ্ডে প্রথম স্ট্যাম্প বিক্রী শুরু হয়; এই কাজের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন Sir Rowland Hill. প্রথম স্ট্যাম্প ছিল কালো রঙের, তাতে Queen Vicfo iar ছবি ছাপা হয়েছিল। স্ট্যাম্পে লেখা ছিল দুটি কথা, Fostrge এবং one Pening এই স্ট্যাম্প যেহেতু পৃথিবীতে প্রথম তাই দেশের নাম ছাপাবার কোন প্রয়োজন হয়নি।

ইংলণ্ডে স্ট্যাম্পের প্রচলন হবার পর অনেক দেশই স্ট্যাম্প প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হলো। ১৮৪৩ সালে ব্রেজিলে এবং সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন অংশে ১৮৪৭ সালে আমেরিকাতে, ১৮৪৯ সালে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে স্ট্যাম্পের প্রচলন শুরু হয়। প্রথম প্রথম স্ট্যাম্পের নকসা তৈরী করা হতো মুদ্রার নকসা অনুযায়ী। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল অন্যান্য বহু জিনিষের চিত্র প্রকাশ করতে। যেমন দেশের স্মরণীয় কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিখ্যাত ব্যক্তি শিল্পজাত এবং কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

এইভাবেই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল বিষয় অথবা চিত্র অবলম্বন করে স্ট্যাম্পের নকশা তৈরী করা এবং আজও সেই প্রবণতা সমানভাবে রয়েছে। এর ফাঁকে স্ট্যাম্পের এলবাম হয়ে উঠেছে সুন্দর আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নকশা তৈরী করা হয়েছে। স্ট্যাম্পে যানবাহনে জাহাজ এবং নৌকার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এতে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস জানার সুযোগ ঘটে।

১৯৬৩ সালে San Marino-এর স্ট্যাম্পে ছাপা হয় খ্রীস্টপূর্ব দুই শতকের জাহাজের নৌকার ছবি ১৯৪৯ সালে Canada-এর স্ট্যাম্পে পনের শতাব্দীর নৌকার ছবি, ১৯৬৫ সালে West Gurmany-র স্ট্যাম্পে দেখা যায় উনিবিংশ শতাব্দীর বাষ্পচালিত জাহাজ এবং আধুনিক জাহাজ।

স্থলপথের যানবাহনও খুবই জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। তোমরা যারা স্ট্যাম্প সংগ্রহ করো তারাও বিভিন্ন দেশের যানবাহনের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। ১৯২২ সালে আমেরিকার স্ট্যাম্পে ছাপা হয়েছিল মোটর সাইকেলের ছবি, ইংল্যাণ্ডের স্ট্যাম্পে জাগুয়ার গাড়ীর ছবি. হাঙ্গেরীর স্ট্যাম্পে ট্রলি বাসের ছবি, বুলগেরিয়ার স্ট্যাম্পে মোটর সাইকেলের সঙ্গে যুক্ত ডেলিভারী ভ্যান।

১৮৫৯ সালে আমেরিকাতে বেলুনকে প্রথম ডাক ব্যবস্থার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এরোপ্লেনকে ব্যবহার শুরু করা হয় নিয়মিত চিঠিপত্র বিলি ব্যবস্থার কাজে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ঘটনাকে স্মরণ রেখে বিভিন্ন ধরণের এরোপ্লেনের ছবি দিয়ে স্ট্যাম্প ছাপা হয়। San marins স্ট্যাম্পে ছিল ১৯০৪ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা নির্মিত এরোপ্লেনের ছবি। ১৯৫৪ সালে অস্ট্রেলিয়াতে স্ট্যাম্প ছাপা হয়েছিল ১৯১৪ প্রথমে যে এরোপ্লেন ডাকবিলির ব্যবস্থা করা হয় তার ছবি।

জীবজন্তুর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে স্ট্যাম্পে, এমন কিপ্রাগৈতিহাসিকযুগের জীবজন্তুর ছবি দেখা

গেছে। ১৯৬৫ সালে পোলাণ্ডের স্ট্যাম্পে দেখা যায় স্টেগোসরাসের ছবি। বিভিন্ন প্রকার ফল ও খাদ্যদ্রব্য এমনকি মাছের ছবিও ছাপা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে হাঙ্গেরীতে ক্ষুধার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য স্ট্যাম্পে বিভিন্ন প্রকার খাবার মাছ, ফল এবং শাকসবজীর ছবি ছাপা হয়েছিল।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবনাও স্থান পেয়েছে স্ট্যাম্পে। শুধুমাত্র জীবজন্তু বা গাছপালার ছবি নয় যারা পোষাক তৈরী করার জন্য চামড়া এবং আঁশ যোগান দেয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে রঙচঙের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যাবহার করা হয় তাকেও ছবিতে স্থান দেওয়া হয়েছে।

যারা সংগীত সম্পর্কে আগ্রহী তাদেরও বাসনা মেটানো হয়েছে। বিখ্যাত সংগীতকার, বাদ্যযন্ত্র, অপেরা এবং ব্যালে নাচ প্রভৃতির ছবিত স্ট্যাম্পে দেখা যায়। ১৯৬৭ সালে ইতালীতে বিখ্যাত সংগীতকার Arturo Toscaning এর দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ স্ট্যাম্প বের করা হয়। হাঙ্গেরীতে বিখ্যাত পিয়ানোবাদক Franz Liszt এর দেড়শত বৎসর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬১ সালে স্ট্যাম্প ছাপা হয়।

বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা ছবি ছাপা হয়েছে স্ট্যাম্পে। ১৯৬১ সালে ফ্রান্সে বিংশ শতাব্দীর Georges Braque-এর আঁকা The Wess-anger নামক ছবিটি স্ট্যাম্পে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃটেনের বিখ্যাত শিল্পী Sir Thomas Lawardnce-এর আঁকা ছবি "Master Lambton" স্ট্যাম্পে দেখা যায়।

বিখ্যাত লেখকদের ছবিও ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রেটবৃটেনে ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে Shakespeare এবং Robert Bwrns, রুমানিয়াতে ১৯৬০ সালে Daniel Defor হাইতিতে Alexander Dumas প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকদের ছবি স্ট্যাম্পে ছাপা হয়েছে।

১৮৯৬ সালে এথেন্সে অলিম্পিকের আসর বসার পর থেকেই স্ট্যাম্পেও খেলা-ধূলা সংক্রান্ত ছবি স্থান করে নিয়েছে। ১৯৬৬ সালে গ্রেট-বৃটেনে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বিশেষ স্ট্যাম্পে বের হয়।

মহাকাশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ মানুষের ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। মহাকাশ গবেষণার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু যে সব দেশ এই গবেষণার সাঙ্গে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে তারা অবশ্য স্ট্যাম্প প্রকাশ করে নি।

১৯৬১ সালে Togo স্ট্যাম্প বের করে মহাকাশ যানে ইয়ুরি গ্যাগারিনের ছবি দিয়ে। ১৯৬৪ সালে কিউবা থেকে প্রকাশিত স্ট্যাম্পে দেখা যায় কৃত্রিমউপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমা করছে এমন ছবি।

গ্রিম ভাইদের গল্প অবলম্বনে মুক্তি। এই গল্পের নায়ক হ্যানস্। সাত বছরের পরিশ্রমের বিনিময়ে পেয়েছিল এক তাল রূপো। তার বদলে আরও অনেক কিছু। সবশেষে সবটাই তার কাছে হয়ে উঠেছিল বোঝা। ওর থেকেই কি মুক্তি চেয়েছিল হ্যানস্?

# মুক্তি

## নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

অনেক কাল আগের কথা। হ্যানস্ নামের একটি ছোট ছেলে জনৈক জোতদারের খামারে কাজ করত। একদিন সে তার মনিবকে বলল,—"আপনার কাছে এক নাগাড়ে আমি দীর্ঘ সাত বছর কাজ করছি। এবার আমি মাকে দেখতে যাব। আমার প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দিন।

—"তোমার কাজে আমি খুব খুশী। সুতরাং তুমি উপযুক্ত পারিশ্রমিকই পাবে"—এই বলে মনিব হ্যানস্কে থলিভর্তি একতাল রূপো এনে দিলেন। রূপোর তালটি ছিল ঠিক হ্যানসের মাথার মতনই গোল আর ভারী।

থলিভর্তি রূপোর তালটি পিঠে নিয়ে হ্যানস্ বাড়ির পথে চলল। যেতে যেতে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখে সে আফশোষ ক'রে বলল:

'একটা ঘোড়া থাকলে মজা
হয় যে খুবই জানি,
জুতো জোড়া যায় না ক্ষয়ে,
বাঁচে পাদুখানি।"

হ্যানসের কথা ঘোড়সওয়ারের কানে যেতেই সে পাল্টা জবাব দিল:

"ঘোড়ার তরে মিছে কেন
ভাবছ অতশত,
ইচ্ছে হ'লে চড়তে পারো
ঠিক আমারই মত।"

হ্যানস্ বলল:

"আমার এই থলিতে একটা রূপোর তাল আছে। এটা আমার মাথার মতনই ভারী, তাই পিঠে নিয়ে বইতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

ঘোড়সওয়ার বলল:

"রূপোর বিনিময়ে তোমায়
ঘোড়াই দিতে চাই,
ইচ্ছে হ'লে নিতে পারো,
পাবে আরাম ভাই।"

ঘোড়সওয়ারের কথা শুনে আনন্দের সাথে হ্যানস্ রূপোর তালটির বদলে ঘোড়াটি চেয়ে নিল। তারপর তার পিঠে চেপে হাওয়ার বেগে ছুটতে লাগল। ঘোড়াটাকে জোরে—আরো জোরে ছোটাবার জন্যে সে অনবরত চাবুক মারতে থাকল। ছুটতে ছুটতে বেচারা ঘোড়াটার পা একখানা পাথরের চাঁইতে ঠুকে যেতেই সে তার পিঠ থেকে

হ্যানস্‌কে এক ঝটকায় ফেলে দিল। হ্যানস্‌ একটা নর্দমার ভিতর পড়ে গেল। তার ভাগ্য ভালো, সে সময় একজন লোক একটা গাইগরু নিয়ে ঐ পথে যাচ্ছিল। হ্যানস্‌কে দেখতে পেয়ে সে ঘোড়াটাকে ধরে হ্যানসের কাছে নিয়ে এল। হ্যানস্‌ নিজেই নর্দমা থেকে উঠে পড়ে গা-গতর মালিশ করতে করতে লোকটিকে বলল, "আমার এই অশান্ত ঘোড়াটার চেয়ে তোমার গাই গরুটিকে আমি বেশি পছন্দ করি। এটিকে নিয়ে কোনো তাড়াহুড়োর দরকার হয় না। উপরন্তু রোজ দুধ পাওয়া যায়।"

লোকটি বলল—"তোমার ঘোড়াটা দিয়ে আমার এই গাইগরুটি নিতে পার।"

লোকটির এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে হ্যানস্‌ ঘোড়াটা দিয়ে গাইগরুটি নিয়ে নিজের পথে চলতে শুরু করল। বেশ খানিকটা পথ চলার পর হ্যানসের খুব পিপাসা পেল। গলা যেন শুকিয়ে কাঠ। তাই সে গাইগরুটি একটা গাছের সাথে বেঁধে দুধ দুইতে শুরু করল। দুঃখের বিষয়, গাইগরুটির দুধের বাঁট থেকে এক ফোঁটাও দুধ বেরুল না। মন খারাপ করে হ্যানস্‌ সেখানেই বসে পড়ল। কপাল খারাপ। বিনা কারণে বেয়াদপ গাইটি আচমকা হ্যানসের মাথায় শিঙের গুঁতো মেরে বসল। মাথা ঘুরে হ্যানস্‌ আবারও একটা নর্দমার ভিতর পড়ে গেল।

একজন কসাই একটি শূকরছানা নিয়ে যাচ্ছিল। হ্যানস্‌কে সে নর্দমা থেকে তুলে নিজের ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা গরম পানীয় খেতে দিল। এক চুমুকে পানীয়টুকু শেষ করে হ্যানস্‌ একটু সুস্থ বোধ করল।

কসাই বলল,—"এ বুড়ো গাইটির কাছ থেকে তুমি কোনদিন এক ফোঁটাও দুধ পাবেনা, বলে দিচ্ছি।"

—আমি বুড়ো গরুর মাংস একদম পছন্দ করি না।

—তাহলে তোমার গাইটি বদলে আমার এই শূকরছানাটি নিতে পার।

হ্যানস্‌ রাজী। কসাইয়ের কাছ থেকে শূকরছানাটি নিয়ে আবার সে পথ চলতে শুরু করল খুশী মনে ভাবল, তার ভাগ্য খুব ভালোই বলতে হবে।

বেশ কিছুদূর যাবার পর একজন গ্রাম্য লোকের সাথে হ্যানসের দেখা হল। বগলদাবা করে লোকটি একটি রাজহাঁস নিয়ে যাচ্ছিল।

গ্রাম্য লোকটির কাছে জিজ্ঞেস ক'রে হ্যানস্‌ জানতে পারল যে কাছেই এক বাড়িতে ভোজ হবে। সেই ভোজের জন্যেই লোকটি এই হাঁসটি নিয়ে যাচ্ছে। কথায় কথায় লোকটি আরও জানাল যে ভালো ভালো খাবার বেশি বেশি খাইয়ে রাজহাঁসটিকে হৃষ্টপুষ্ট করা হয়েছে; সুতরাং এর মাংস খুব সুস্বাদুই হবে।

হ্যানস্‌ বলল,—"হ্যাঁ! এ'কথা সত্যি। আমিও কম ভাগ্যবান নই, কেননা আমারও একটা মোটাসোটা শূকরছানা আছে। তারপর সে খুশী মনে গান ধরল:

"আমার আছে একটি
হৃষ্টপুষ্ট শূকরছানা,
ভয় ভাবনা দুঃখ আমার
নেইক মোটে জানা।
দরাজ গলায় হেসে হেসে
বিপদ-আপদ দলি,
নিত্য আমি সহজ সরল
পথে পথেই চলি।"

শূকরছানাটির দিকে তাকিয়ে গ্রাম্য লোকটি গম্ভীর হয়ে হ্যানস্‌কে বলল,—"ক্ষুদে বন্ধু, তোমার যাতে ভালো হয়, তা' করতে আমি কিছুই মনে করি না। আমি যে গ্রাম থেকে এসেছি, সেই গ্রামের জমিদারের একটি শূকরছানা চুরি হয়েছে বলে শুনে এসেছি। যে লোকটা ওটা চুরি করে এনেছে, সে হয়ত তোমাকে বলেছে যে ওটা তারই। এটাকে নিয়ে দেখছি তুমি বিপদে পড়বে।

রাজহাঁসটির দিকে তাকাতে তাকাতে হ্যানস্‌ ব্যাকুলতার সাথে বলল,—'পারেন ত আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচান! সত্যি বলছি, আমার গাইগরুটি দিয়ে একজন কসাইয়ের কাছ থেকে এই শূকরছানাটি নিয়ে এসেছি। সে-কসাই হয়ত ঐ জমিদারের এলাকা-তেই বাস করে। আমার শূকরছানাটি নিয়ে আপনার রাজহাঁসটি দিন না আমাকে!"

লোকটি বলল,—"শূকরছানাটার

বিনিময়ে আমার হৃষ্টপুষ্ট রাজহাঁসটি নিতে চাইছ! মনে রাখবে, সব লোক এমন কাজ করে না। যা হোক, আমি নিষ্ঠুর লোক নই। তুমি বিপদে পড়েছ জেনেই তোমার উপকার করতে রাজী হচ্ছি।"

শূকরছানাটির বিনিময়ে রাজহাঁসটি বগলদাবা করে হ্যানসের আবার পথ চলা শুরু হল। মনে মনে সে ভাবল, এই সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট রাজহাঁসটি দেখে মা খুব খুশী হবেন নিশ্চয়ই।

গ্রামে ঢুকতেই সে ছুরি-কাঁচি শান-ওয়ালা একটি লোক দেখতে পেল। লোকটি বিরাট গোলাকার একখানা শানপাথর ঘুরিয়ে ছুরি শানাচ্ছে আর গাইছে :

"পাহাড়ে এবং উপত্যকাতে
যেখানে যখন যাই
সেখানেই থাকি পরমানন্দে—
মনে কত সুখ পাই!
কাজ করি কম, বেঁচে আছি ভালো,
পৃথিবী আমার কড়ি,
আমার মতন খুশী কেউ নেই—
একথা বলতে পারি।"

সেখানে একটু থেমে হ্যানস্ শান-ওয়ালাকে বলল,—"তোমার খুব টাকা-কড়ি আছে, তাইত তুমি খুশী মনে কাজ করছ, তাই না?"

শানওয়ালা বলল,—"হ্যাঁ! এক-খানা শানপাথরের দৌলতে অল্পদিনের মধ্যেই অনেক টাকা আয় করা যেতে পারে। তোমার কাছে একটি রাজহাঁস আছে, দেখছি। কত টাকায় কিনলে ওটা?

হ্যানস্ বলল,— 'একটি শূকরছানার বদলে।"

—শূকরছানাটির দাম কত?

—এর জন্যে আমাকে একটি গাই-গরু দিতে হয়েছে।

—গাইগরুটির জন্যে তোমাকে কী দিতে হয়েছে?

—একটা ঘোড়া।

- আর ঘোড়াটার জন্যে?

—আমার মাথার মতন বড় এক রুপো।

—রুপোর জন্যে?

—সাত বছরের পরিশ্রম।

শানওয়ালা বলল,—"এ পর্যন্ত তুমি ভালোই করেছ। এখন তোমার দরকার হচ্ছে আমার মতন একটা ব্যবসা করা। তাহলে তোমার জামা-প্যান্টের পকেটে সব সময়ই টাকাপয়সা থাকবে। আমার একখানা বাড়তি শানপাথর আছে। তোমার রাজহাঁসটি পেলে তোমাকে এই পাথরখানা দিতে পারি। নেবে তুমি?

হ্যানস্ রাজী হয়ে গেল। রাজহাঁস-টার বিনিময়ে শানপাথরখানা নিয়ে সে বেশ হাল্কা মনে ঘরের পথে চল। কিন্তু আর সামর্থের তুলনায় শানপাথরখানা ছিল খুবই ভারী। তাই অতি কষ্টে পথ চলতে চলতে সে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। সামনে একটা নদী। নদীতীরে বসে খানিকটা জিরিয়ে নিতে বাধ্য হল সে। তার জলপিপাসাও পেয়েছিল। আঁচলা ভরে নদীর জল খেতে যেতেই তার পায়ের ধাক্কায় শানপাথরখানা গড়িয়ে গড়িয়ে জলে পড়ে ডুবে গেল।

যাক্ বাঁচা গেল! মনের আনন্দে হ্যান্স্ চেঁচিয়ে বলল,—আমার কত সুখ! সব বোঝার ভার থেকে আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত!"

তারপর প্রায় লাফাতে লাফাতে ঘরে ফিরে এসে সে মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলল। দীর্ঘ সাত বছর পর ছেলেকে কাছে পেয়েই মা খুশী! ছেলে যা করে এসেছে সে-কথা একবারও তাঁর মনে ঠাঁই পেল না। ●

# উরুচ্চারণ

**রবীন সুর**

ক্রিকেট ম্যাচে দিতে গিয়ে ফিল্ডিং
ভাঙা শিশিতে পা কেটেছে,
সে কি ভীষণ বিল্ডিং।
বাঁচা গেল ভাবটা আমার
যাবো না আজ স্কুল
বাড়ি বসে সারা দুপুর
সাঁটাবো টোকো কুল!
অথচ হায় থার্মোমিটারে
জ্বর ওঠে না মেপে
শরীরখানা সমস্তক্ষণ
উঠছে খালি কেঁপে।
রকমসকম দেখে শুনে
আমার বড় দাদা
সকালবেলা চায়ের সঙ্গে
মিশিয়ে দিলেন আদা,
চা-টি ভালো—
যেমনি লিভার তেমনি ফিভার,
ম্যাজম্যাজানি ভাবটা গিয়ে
মেজাজ চমৎকার।
এই অব্দি লেখার পর
মাথাটা গেল ধরে,
আর কি ছড়া জমতে পারে
এবম্বিধ উরুচ্চারণ করে?
দিদির বর প্রিন্সিপ্যাল
ছিলেন হাভানাতে,
বলেছিলেন, জিবটা ছুলে
নিলে পরেই ফলটা পাবি হাতে।
ট্যাক্সি নেই রিক্সো করে
গেলুম হাঁসপাতাল,
মামা ডাক্তার, ধরে ফেললো
আমার কূট চাল :
"এমন কিছু হয়নি তোর
পরীক্ষা তো সামনে
পড়াশোনা চালিয়ে জোর
ইস্কুলে যাও লক্ষ্মী আমার ভাগ্নে।"
ছুটির ট্রেন ছাড়লো না রে
রেড সিগ্নাল দেখে
এসব হুস্থু ভুস বানানে
জানাই কাকে ডেকে?

# মণিমুক্তা

## সংকলক ঃ ত্রিদিব

আমরা যখন আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ভুলে গিয়ে বিপথগামী হই তখনই সত্যিকারের অকৃতকার্যতা আসে—
—জ্যাকুলিন মিলার

টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, চরিত্রই বাধা বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে—স্বামী বিবেকানন্দ

অহংকার মানুষের পতন ঘটায়, কিন্তু বিনয় মানুষের মাথায় সম্মানের মুকুট পরায়- —বাদশা সোলেমান

তিল তিল করে মানুষের কল্যাণ সাধনে ক্রন্ত হৃদয়কে তৈরী করতে হবে। তা হলে একদিন দেখবে তুমি জাতির সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে হয়তো সবচেয়ে বেশী কল্যাণ সাধনে সফল হয়েছে- —লিও টলষ্টয়

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল—ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, *ঐ দেখ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের* দুয়ারে দাঁড়াইয়া, তারা প্রতিকার চায়। তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের, তোমরা বাহিরে এস এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ে পড়া শকুনির দলকে- —কাজী নজরুল ইসলাম

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা এতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না—স্বামী বিবেকানন্দ

দাসত্ব যদি অন্যায় না হয়, তাহলে পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছু নেই- —আব্রাহাম লিঙ্কন

যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই অশ্রুর দ্বারা না পাই তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না। যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়।- —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে অর্থ মানব কল্যাণে ব্যয়িত হয় না যে বিদ্যা মানুষকে সত্য ও ন্যায় মহিমা শোনাবার জন্য লাভ হয় নি সে অর্থ, সে ক্ষমতা সে বিদ্যার কোন মূল্য নেই।- —ডাঃ লুৎফর রহমান

# জ্যোতিষ্ক

## অমরেন্দু ঘোষ

**মতিলাল নেহেরু**—একজন প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমী, বিখ্যাত আইনজীবী এবং স্বরাজ পার্টির নেতা। ইনি জওহরলাল নেহেরুর পিতা ছিলেন।

**তুলসীদাস**—তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালী কবি। রামচন্দ্রের জীবনী নিয়ে তাঁর লেখা 'রামচরিতমানস' একটি অমর গ্রন্থ।

**গ্যালিলিও**—( ১৫৬৪ ১৬৪২ ) একজন ইটালীয়ান বৈজ্ঞানিক এবং অঙ্কের অধ্যাপক। তিনি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন এবং সারাজীবন জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন।

**আবুল ফজল**—( ১৫৫১—১৬০৫ ) মোঘল সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর লেখা অমর গ্রন্থ 'আইন-ই আকবরী' এবং 'আকবর নামা।'

**বানভট্ট**—সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় কবি এবং পণ্ডিত। *সংস্কৃত ভাষায় লেখা 'কাদম্বরী' ও হর্ষচরিত আমাদের জাতীয়* সম্পদ।

**অ্যানি বেসান্ত**—( ১৮৬৪—১৯৩৩ ) জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন আইরিশ মহিলা, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল সীমাহীন। তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী।

**ভাস্করাচার্য**—একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার উপর অমূল্য গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' তাঁরই লেখা।

**নন্দলাল বসু**—একজন ভারতীয় শিল্পী এবং শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিল্পকলা বিভাগের পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

**চাণক্য**—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চাণক্য। ইতিহাসে তিনি কৌটিল্য নামে বিশেষ পরিচিত। তাঁর লেখা আর্থশাস্ত্র একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থ।

**কুবলাই খাঁ**—মোঙ্গল সম্রাট, দৃঢ়চেতা শাসক এবং সাহসী পুরুষ। ইনি ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশধর।

**পাণিনি**—বৈদিক যুগের হিন্দু প্রাজ্ঞ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ছিলেন।

# আরব্যরজনীর গল্প

•সিন্দবাদ•

লেখা : মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : রতন মুখোপাধ্যায়

২ আরব্যরজনীর গল্প

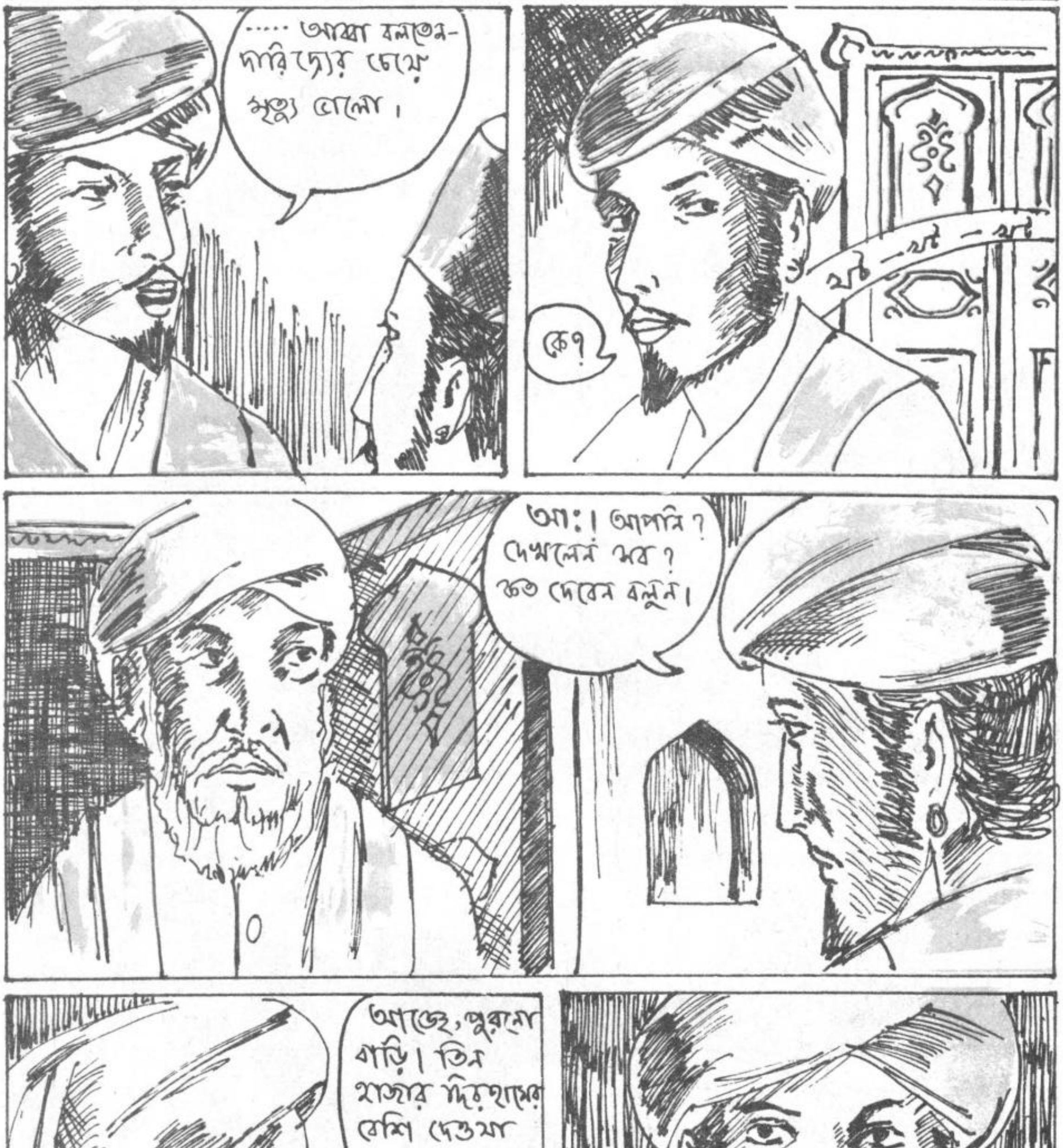

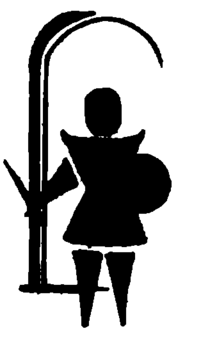

# তরবারি

## সুদেব বক্‌সী

"কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী।

যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব ওঠে—ঝাড় সাম্‌লে—ঝাড় সাম্‌লে! ..... ..... কিন্তু যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!"

—দৃশ্যটি বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালীর" অপুদের গ্রামের যাত্রাপালার আসরের। অপুর চোখের সামনে এইসব ঘটে যাচ্ছে। এই তরবারির খেল্ দেখে অপু কখনো শিউরে উঠছে, কখনো উল্লাসে ফেটে পড়ছে। অপুর চোখের পাতা পড়ে না। আমরাও যখন ছোট ছিলাম, যাত্রাগানের আসরে বসে সারাক্ষণ ঝিমোতাম—শুধু যখন যুদ্ধ বা তলোয়ারের খেল্ শুরু হত, ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনে জেগে উঠতাম, নড়েচড়ে বসতাম, চোখ বড় বড় করে দেখতাম। তরবারির নামে যাদু আছে—সেই যাদুই ছোটবেলাকার যাত্রা-দেখার আসল আকর্ষণ। যাত্রা ভাঙলে পরদিন থেকে আমরা ছোটরাও যাত্রায় নেমে যেতাম। বাঁশ বা কাঁচের তলোয়ার বানিয়ে যুদ্ধ করতাম। গ্রামের ছেলেরা যাত্রার যুদ্ধ দেখে এটা করেই—অপুও করেছিল।

এই তরবারির নাম কেনা শুনেছে, কেনা দেখেছে। তরবারির সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ না হলেও যাত্রা সিনেমায় নিদেনপক্ষে ছবিতে তো দেখা যায়। ইতিহাস বইয়ের রাণা-প্রতাপ শিবাজী, রণজিৎ সিং, টিপু সুলতানের কথা ভাবো দেখি। তাদের কোমরে ঝোলানো ইয়া-বড় তরবারি। কি, মনে পড়ছে তো তরবারির চেহারা? তরবারি বলতে তো সোজা বাঁকানো লম্বা একটা ধাতুর পাত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর একদিকে থাকে হাতল; চায়ের কাপের ধরণীটা একটু বড় মাপের হলে যে আকার পায়—তরবারির হাতলটাও তাই। তরবারি তৈরীর আদিযুগে কিন্তু এরকমটা ছিল না। তখন তরবারি ছিল ছোরার আকারের। তরবারির পাতটি হত ছোট আর একদিকে ছুঁচলো—এর বাঁটও ছিল খুব সাধারণ—কাস্তে বা দা-য়ের বাঁটের মতোই। ব্রোঞ্জ-যুগের মাঝামাঝি প্রথম তরবারির আবিষ্কার। সম্ভবত প্রস্তর যুগেই এই অস্ত্রটি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা জন্মাতে থাকে। গাছের লম্বা ডালের পরবর্তী উন্নত সংস্করণ খুঁজতে গিয়ে আদিম গুহা-মানবেরা এই অস্ত্রটির ভাবনা ভেবে ফেলে তখন থেকেই। কিন্তু পাথর দিয়ে তো আর এই এতো লম্বা লম্বা সরু অস্ত্র বানানো যায় না। তাই তাদের অপেক্ষা করতে হল ব্রোঞ্জের ব্যবহার না-শেখা পর্যন্ত। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ষোল শ' বছর আগে প্রথম ব্রোঞ্জের তরবারির আবিষ্কার হল। এখনকার ছোরার সঙ্গে এর বড় একটা তফাৎ ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্বাব্দ দ্বাদশ শতকে এই 'ছোরা'র ফলকটিই লম্বা হল। আরো পোক্ত হল—এর দুটো কিনারাই হল ধারালো ও সমান্তরাল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যবহার হতে লাগলো এই তরবারি। তারপর লৌহযুগের শুরুতে তরবারির বাঁটটি হল লোহার। কালে কালে তরবারির গোটা শরীরই লোহা দিয়েই গড়া হতে লাগলো। লোহার তরবারি প্রথম দেখা গেল খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে।

তারপর মধ্যযুগে তরবারি লম্বায় বেড়ে গেল তর্‌তর্ করে। প্রাচ্যে ঢালাও ভাবে শুরু হল এই তরবারির ব্যবহার, পরে ইউরোপবাসীদের হাতেও এই তরবারি সোজা পেতে লাগলো। চতুর্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেকার সময়ে তরবারি রূপান্তর হল। এই তরবারির দুই কিনার আর সমান্তরাল রইল না। হল ছুঁচালো খোঁচা মারার জন্য দু'দিকে ধারালো সোজা তরবারি আবিষ্কার হল। তারপর এর হাতলও ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগলো। হাতল হল ব্যবহারকারীর হাতের রক্ষাকবচ। সোনারত্ন দিয়ে ঢেকে এই হাতলকে আরো বাহারী করে তোলা হল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে দু'ধার-ধারালো, সোজা, লম্বা তরবারি নিজের গুরুত্ব হারালো উনবিংশ শতাব্দী থেকে খড়্গাকৃতির একদিক ধারালো বাঁকা তরবারিই আবার জাঁকিয়ে বসলো।

এখন অবশ্য এই পরমাণুর যুগে তরবারি কোন অস্ত্রই নয়, খেলনা। খেলনাই তো! এখন বড় বড় খেলার আসরে অসিযুদ্ধ' একটা ইভেন্ট্'। এই খেলায় জাপানীরা খুব এগিয়ে। ওদের দেশে দু'শরও বেশী স্কুল আছে তরবারি খেলা শেখাবার জন্য। অবশ্য কোন কোন দেশে এই তরবারি নিছক অস্ত্র বা খেলনা নয়, তা ধর্মের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতীক কিংবা বিচারের প্রতীক।

# মহাকবির মহত্ত্ব

## কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজসভায় তখন কালিদাস উপস্থিত নেই।

সভা জমজমাট মহারাজ কিছুটা আলস্য নিয়ে সভাসদদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এই সময় একজন বললেন, আপনার নবরত্ন সভায় সত্যি কালিদাসের তুলনা নেই। তবে তিনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে মাছ খেয়ে থাকেন, এ কিন্তু ঠিক নয়। মহারাজ ঘোর বিস্ময়ে বললেন, সে কি কথা! অসম্ভব। কালিদাস কখনও এরকম পাপকাজ করতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

রাজসভার কয়েকজন পণ্ডিত কালিদাসের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, মহারাজ, আপনাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাতে পারলে নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন?

—হ্যাঁ। তাহলে তো চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়েই গেল।

কোনক্রমে কালিদাস একথা জানতে পেরে স্থির করলেন পণ্ডিতদের উচিত শিক্ষা দেবেন। কয়েক দিন পরে তিনি নদীতে স্নান সেরে, একটা বড় মাছ চাদরের মধ্যে জড়িয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। পণ্ডিতদের দৃষ্টি তা এড়াল না। তাঁরা ছুটে গিয়ে মহারাজকে খবর দিলেন, কালিদাস স্নান সেরে বাড়ী ফিরছেন। এখনি তাঁকে ডেকে পাঠান। তাঁর চাদরের মধ্যে মাছ লুকানো আছে।

মহারাজা বললেন, বেশ। আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তবে অভিযোগ যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আপনারা তাহলে কঠিন শাস্তি পাবেন।

পণ্ডিতরা নিশ্চিত ভাবে জানতেন কালিদাসের চাদরের তলায় মাছ পাওয়া যাবেই। তাঁরা সহাস্যে নীরব রইলেন। মহারাজা সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, মহাকবি নদীর তীর থেকে গৃহে ফিরছেন। তাঁকে অবিলম্বে সভায় উপস্থিত করা হোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি কালিদাসকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। মহারাজ লক্ষ্য করলেন, কালিদাসের বগলে চাদর জড়ান কি একটা রয়েছে। জায়গাটা ভিজে এবং তা অল্প অল্প নড়ছে।

মহারাজ প্রশ্ন করলেন, কক্ষে কিং। (তোমার বগলে কি?)

কালিদাস। মম পুস্তকং। (আমার বই।)

মহারাজা। কিমুদকং। (জল পড়ছে কেন?)

কালিদাস। কাব্যেষু সারোদকম। (কাব্যের সার তো জলই।)

মহারাজা। গন্ধ কিং। (গন্ধ কেন?)

কালিদাস। নমু রাম-রাবণ বধং সংগ্রাম গন্ধোৎকট। (রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে তাই রণক্ষেত্রের উৎকট গন্ধ।)

মহারাজা। জীব কিং (জ্যান্ত কেন?)

কালিদাস। মম গৌড় মন্ত্র লিখিতাং সঞ্জীবনং পুস্তকম। (এটি গৌড় মন্ত্রে লেখা জীবন্ত বই।)

মহারাজা। পুচ্ছ কিং? (লেজ কেন?)

কালিদাস। খলু তালপত্রে লিখিতং। (তালপত্রে লেখা পুঁথি বলে এরকম।)

মহারাজা। হা হা গুণাঢ্য ভবান। (আহাহা তুমি বড় গুণবান।)

একথা বলেই মহারাজ কালিদাসের চাদরে টান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা তালপাতার একটা পুঁথি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। মাছের বদলে পুঁথি দেখে গোয়েন্দা পণ্ডিতদের মুখ শুকিয়ে উঠল।

মহারাজ তাঁদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। আপনাদের নগর থেকে বহিষ্কার করা হল।

কালিদাস বিস্ময়ের ভান করে বললেন, রাজন, ঘটনাটা কি?

মহারাজ ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

সমস্ত শুনে কালিদাস বললেন, দেশে উত্তম মধ্যম দুই শ্রেণীর মানুষই বাস করে। রাজা সকলকে সমভাবে পালন করবেন এই হল রাজধর্ম। বটগাছ যেমন সব শ্রেণীর মানুষকে সমান ভাবে ছায়া দেয়, তেমনি আপনার ছায়ায় আমরা সকলেই বাস করছি। আমার একান্ত প্রার্থনা, পণ্ডিতদের আপনি ক্ষমা করুন। মহারাজ এই কথা শুনে সকলকে ক্ষমা করলেন। তারপর বললেন, কালিদাস, যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করে, তুমি তারও উপকার করবার চেষ্টা কর! সত্যি তোমার তুলনা হয় না।

কবি শুধু মৃদু হাসলেন। ●

# আব্রাহাম লিঙ্কন
## রবীন্দ্রনাথ দেবপুত্র

**পৃথিবীর সব মহাপুরুষ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক কিংবা মনীষীদের জীবনী সম্বন্ধে গভীর ভাবে জানতে তোমাদের সকলেরই ইচ্ছে করে। কেননা, এই সব ব্যক্তিগণ অনির্বাণ দীপশিখার মতই। তাই তোমাদের প্রয়োজনবোধ ও ভাললাগা নিয়েই তোমাদের নিজস্ব পত্রিকায় এই বিভাগ খোলা হয়েছে। তোমরাও জীবনী বিষয়ক রচনা ছবিসমেত লিখে পাঠাও।**

কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ বড় হয়, আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবন আমাদের সেই কথা মনে করিয়ে দেয়। জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভাল, এ প্রবাদ নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ, লিঙ্কনের জীবন সেই আদর্শের প্রতীক, অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে জন্মেও বড় হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর অধ্যবসায় তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল সাফল্যের শীর্ষে।

জীবনে ব্যর্থতা এসেছে অনেকবার কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি কখনও। তিনি জীবনের শুরুতে ছিলেন কাঠুরিয়া, তারপর মাঝি জমি পরিমাপককারী, গ্রামের পোষ্ট-মাষ্টার, আইনজীবী, কংগ্রেসের সদস্য এবং সবশেষে দেশের প্রেসিডেন্ট এইভাবেই লিঙ্কনের জীবন পরিণতির দিকে এগিয়েছে আজকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র লিঙ্কনের জন্যই যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে তার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে।

১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী হার্ডিন ( বর্তমানে লা রুাই ) কাউন্টি, কেন্টাকীর এক ছুতোরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আব্রাহামের বাবা টমাস লিঙ্কন ছিলেন খুব অস্থির মনের তাই পরিবার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু কিছুতেই সংসারের অভাব মেটাতে পারেন নি। ১৮১৬ সালে ইণ্ডিয়ানার স্পেন্সার কাউন্টি তে এসে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এখানে একবছর থাকতে হয়েছিল ক্যাম্পে—শুধু তিন-দিক ঘেরা, মেঝে নেই, সামনের খোলা অংশ ঢেকে রাখার জন্য জীবজন্তুর কাঁচা চামড়া ঝুলিয়ে রাখতে হতো এক সময়ে তিনি ছোট কুটির তৈরী করেছিলেন, কিন্তু জীবন ছিল কষ্টের সমস্ত অঞ্চলটা ছিল জলাভূমি তাই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল খুব বেশী।

এখানে আসার দু'বছর পরে লিঙ্কনের মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন, ডাক্তার ডাকার জন্য যেতে হয়েছিল ৩৫ মাইল দূরে। কিন্তু তাঁকে এক সপ্তাহের বেশী বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। দুর্বল শরীরে উপযুক্ত খাদ্য না পেয়ে তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আব্রাহাম এতদিন লেখাপড়া করার কোন সুযোগ পান নি, তাঁর বাবা লেখাপড়ার ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু আব্রাহামের সৎমা বললেন, সকলকেই স্কুলে যেতে হবে লেখাপড়া শেখার জন্য। তিনি সৎ-ভাইবোনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অটুট ছিল।

আব্রাহাম খুব বেশী হলে এক বছর মাত্র স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু জ্ঞান পিপাসা ছিল অদম্য তাই যা সামনে আসত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তা পড়ে ফেলতেন। উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রতিবেশীদের কাছে পাগলাটে মানুষ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানকার মানুষ তাঁর কৌতুক-প্রিয় কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনতো তাঁর সমকক্ষ বক্তা আর কেউ ছিল না।

১৮২৮ সালে তাঁর জীবনে প্রথম সুযোগ আসে বাইরের পৃথিবী দেখার। তিনি নিউ অরলিন্স এসে উপস্থিত হলেন নৌকা নিয়ে উদ্দেশ্য চাষের জমিতে উৎপন্ন ফসল বিক্রী করা। সেখানে প্রথম দেখলেন দাস-বৃত্তি। এখানে দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ যখন পেয়েছিলেন, তখন একমাস থেকে নিগ্রো দাসদের অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছিলেন।

তারপর নিউ সালেমে স্টোর-ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করলেন তাঁর মালিক। এখানে এসে লিঙ্কন জীবনে প্রথম সুযোগ পেলেন লেখাপড়া করার। স্থানীয় নির্বাচনে কেরাণীর কাজ করার সুবাদে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়

ঘটলো। এরপর থেকেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। পরিচয় হলো জেমস রুথলোজের সঙ্গে, যিনি লিঙ্কনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এল বাধা। ১৮৩২ সালে তিনি ইলিনয়েজ বিধানমণ্ডলীর সদস্য হবার জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু পরাজিত হলেন। স্টোর-ম্যানেজারের চাকরিটিও চলে গেল কারণ মালিক দেউলিয়া হয়ে যাওয়াতে আর ব্যবসা চালাতে পারেন নি।

তিনি নিউসালেমে কিছুদিনের জন্য পোস্ট মাষ্টারের কাজ করেছিলেন, তারপর সহকারী জমি-পরিপামককারী হয়েছিলেন। ১৮৩৪ সালে আবার প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালেন কিন্তু এবার জিততে অসুবিধা হন নি।

ইলিনয়েসের নতুন রাজধানী স্প্রিঙ্গফিল্ডে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন। আইন পড়া শেষ করে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন। কিন্তু পেশার দিকে মনোযোগী ছিলেন না, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে বেশী পছন্দ করতেন, তাই এই পেশায় সাফল্য আসে নি। তিনি ১৮৩৮ ও ১৮৪০ সালে দুবারই পুনরায় নির্বাচিত হন। কিন্তু শুধুমাত্র স্প্রিঙ্গফিল্ডে প্রতিনিধি হয়ে থাকলে চলবে না, আরো এগোতে হবে, দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল আইনসভার কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করা প্রয়োজন। ১৮৪৬ সালে তিনি কংগ্রেসে মনোনীত হলেন, ১৮৪৭ সালে তিনি ওয়াশিংটনে চলে আসেন।

নিউ অরলিয়ঁতে নিগ্রো-দাসদের

যে অমানবিক দুর্দশার ছবি তিনি দেখেছিলেন তা তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই দাস প্রথা বিলোপের জন্য তিনি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে একটি বিল পেশ করলেন, কিন্তু তা গৃহীত হয় নি। লিঙ্কন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন স্প্রিঙ্গফিল্ডে আবার শুরু করলেন আইন ব্যবসা। লিঙ্কন দ্বিতীয় বারের জন্য মনোনয়ন পেলেন না।

আইন ব্যবসায়ে সাফল্য আসছে, রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ কমছে, ১৮৫৪ সালে আবার ভাবনা এল মাথায়. তাই তিনি ঘোষণা করলেন, যে দেশে দাস-ব্যবসা চলছে সে দেশের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না এইবার তিনি সেনেটের জন্য প্রার্থী হলেন, কিন্তু হেরে গেলেন।

১৮৫৮ সালে রিপাবলিকান পার্টি লিঙ্কনকে সেনেটের প্রার্থী হিসাবে বেছে নিল, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডগলাস। ডগলাস নির্বাচিত হলেন, লিঙ্কন কিছুটা আশাহত হলেন, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারেন নি। নিউইয়র্কে এক সভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি সমস্ত আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ১৮৬০ সালে রিপাবলিকান পার্টি চিকাগোতে মিলিত হয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত করলো। তাঁর বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাট পার্টির পক্ষ থেকে প্রচার শুরু হলো—একজন তৃতীয় শ্রেণীর আইনজীবি, এমন কি একজন ভদ্রলোক নন, তিনি একজন গরিলা।

প্রতিপক্ষের সব বিকৃত প্রচার উপেক্ষা করে তিনি নির্বাচিত হলেন। ১৮৬১ সালের ৪ই মার্চ তারিখে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ সালে দাস ব্যবসা চিরকালের মতো উচ্ছেদ করার জন্য আমেরিকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনের বিল পাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এমন একজন মানুষকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তিনি গিয়েছিলেন ফোর্ড থিয়েটারে নাটক দেখতে। স্টেজ বক্সে লিঙ্কন বসে আছেন, নাটক শুরু হয়েছে। দুঘণ্টা হয়ে গেছে, এমন সময় একজন লোক এসে দাঁড়াল বক্সের দরজার সামনে। তদারককারীকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে বললো, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে রাষ্ট্রপতিকে। ভেতরে ঢুকেই লিঙ্কনের কানের কাছে পিস্তল তুলে ধরে গুলি করলো। অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন সারারাত, পরের দিন সকাল সাতটায় তিনি মারা যান। তাঁর হত্যাকারী জন উইলসেস বুথ ছিল একজন অভিনেতা, লিঙ্কনকে হত্যা করে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গিয়েছিল মেরীল্যাণ্ডের দিকে। লিঙ্কনের মৃতদেহ নিয়ে বিরাট শোকমিছিল বেরিয়েছিল ওয়াশিংটন থেকে, যার সমাপ্তি ঘটেছিল স্প্রিঙ্গফিল্ডে এসে।

# গোয়েন্দা কাহিনী

## গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কেউ পরেছে হলুদ মেরুন,
কেউ পরেছে নীল সোয়েটার,
কেউবা জড়ায় কমলা রঙ,
ময়ূরকণ্ঠী গায়ে র‍্যাপার।
জানতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি ?
কেউ কোথায় যাচ্ছে নাকি ?
কেন এত ধুম পড়েছে
চতুর্দিকে সাজা-গোজার ?

পিটেপুলির গপ্পো শুনে
তিন গোয়েন্দার হচ্ছে সন্দ,
অলস রোদের আলসেমিতে
ছড়াচ্ছে কেউ নানান ধন্দ।
ছড়ায় খবর চার তল্লাটে,
হিম পড়েছে মাঠেঘাটে।
কেউবা বলে, 'তাই তো বটে,
নলেন গুড়ের পাচ্ছি গন্ধ।'

# ভূত ভূতুড়ে

## বিমলেন্দু চক্রবর্তী

জ্যান্ত ভূতের কয়টি মাথা, কয়টি পাকা চুল ?
ভাবতে গিয়ে চুল উঠে টাক বেরুলো বিলকুল।

জ্যান্ত ভূতের বাচ্চা ক'টি, কাদের সাথে মিল ?
ভেবে ভেবেই টাক থেকে চুল বেরুলো কিলবিল !

জ্যান্ত ভূতের চারপাশেতে ক'খান কালো হাত ?
রক্ত চোষা, নাকি সে খায় পাউরুটি আর ভাত !

জ্যান্ত ভূতের ক'টুক জমি ক'খান বাড়ি গাড়ি ?
দুঃস্থ গরীব বন্ধু ক'জন, কয়টি ঢাউস হাঁড়ি

জ্যান্ত ভূতের গুল গপ্প, জ্যান্ত কি আর আছে ?
সন্ধ্যে সকাল মামদোভূতুম ঘুরছে ধারে কাছে।

জ্যান্ত ভূতের গপ্প শুনে পাচ্ছি না তো ভয়,
মরুক ঘুরে মামদোগুলো গপ্পে শহরময়।

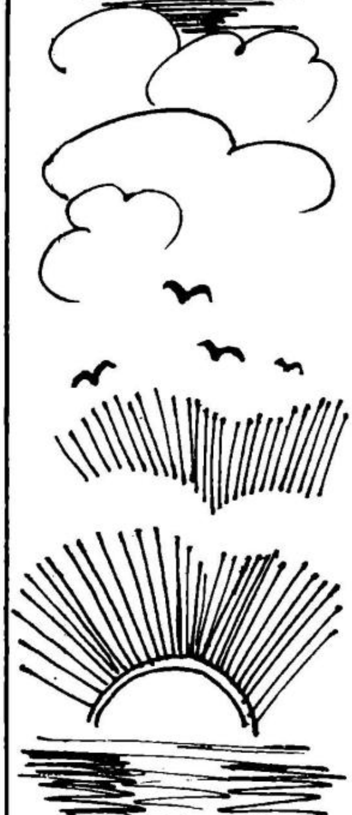

# ছড়া

## সরল দে

চলতে চলতে রাত ফুরায়
রাত ফুরাতে সাতপুরায়।
সাতপুরাতে সাত পাড়ায়
সাত সতেরো হাত বাড়ায়।
হাত বাড়াতেই কাক ডাকে
ঘোর কেটে যায় হাঁকডাকে।
ঘুম পাড়ানোর তানপুরায়
তার ছিঁড়ে যায়, গান ফুরায়।
সাতপুরা কেউ ? পাকপাড়ায়
ফাঁক গ'লে রোদ নাক বাড়ায়।

# দুষ্টু

জন কীটস্

সেই ছেলেটা দুষ্টু ছিল
দুষ্টু ছিল ভীষণ,
স্কটল্যাণ্ডে পালিয়ে গেল
দেখতে মানুষ-জন।

সেই দেশে সে দেখতে পেল
শক্ত পোক্ত মাটি,
উঠোন-টুঠোন একই রকম
লম্বা পরিপাটি।

গান শুনে মন প্রফুল্ল হয়
চেরির ফলও লাল.
ধাতুর মধ্যে শিসে ভারী
সেথায় চিরকাল।

চারকুড়িতে আশি কেন
অন্য সংখ্যা হত ?
দরজাগুলো কাঠের, আবার
ইংল্যাণ্ডের মত !

দুষ্টু ছেলে অবাক চোখে
দাঁড়িয়ে তখন ভাবে.
সব দেশই তো একই রকম,
পালিয়ে কেন যাবে ?

ভাষান্তর : সুধীন্দ্র সরকার

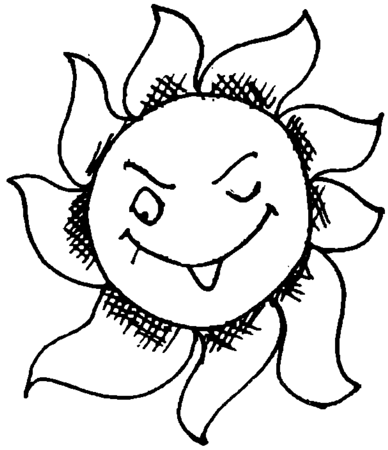

# ছুটির ছড়া

পঞ্চানন মালাকর

সোনা রঙের কী রোদ্দুর
ছড়িয়ে আলোর সমুদ্দুর
ডাক দিয়ে যায় ছুটির দিন।
চল ছুটে যাই তা ধিন-ধিন।
রূপশালী ধান দুলছে মাঠে,
খুশির গানে দিন যে কাটে।
পড়াশুনার বছর শেষ,
চল বেড়াতে নিরুদ্দেশ।
শীতের হাওয়া জমকালো,
ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় চমকালো।
গল্প কথার তেপান্তর,
চল বেড়াতে নেইকো ডর।
খুশীর টানে সবুজ বন,
হাতছানি দেয়, আকুল মন।
সবাই মিলে যাই যেখানে।
তার ঠিকানা কজন জানে ?

# খুকুর ঘরকন্না

রাসবিহারি দত্ত

খুকু খেলে ঘর-কন্না
সঙ্গী পুতুল পুষি
চড়ুই-শালিখ-বুলবুলি
আর ছোট্ট মৌ-টুসি।
খুকু খেলে ঘর-কন্না
সাত ব্যঞ্জন পাতে
পুতুল পুষির তর সয় না
ভোজন রসে মাতে।
খুকুর হলো মান-অভিমান
কেবল খাওয়ার ছল
কাজ কম্মে অষ্ট রম্ভা
অকম্মাদের দল।
ধমকে বলে চুপ করো সব
কেবল খাই খাই,
ঘর-কন্না রইল পড়ে
বাপের বাড়ি যাই।

# পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা

## পুনশ্চ সান্যাল

বিধানসভার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। বিশেষ করে যারা ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট অথবা ফুটবল খেলা দেখতে গেছ তাদের চোখে তো পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ভবনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (এম. এল. এ) এসে মিলিত হন, আলাপ আলোচনা করে শাসন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যে রাজনৈতিক দল বেশি সংখ্যক প্রতিনিধির সমর্থন লাভ করেন, তারাই সরকার গঠন করতে পারেন। প্রতিনিধিরা কোন দলকে সমর্থন করছেন তার প্রমাণ এখানেই হওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ইতিহাস আরম্ভ ১৮৬২ সালে, বৃটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলাদেশে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৮৯২ ও ১৯০৯ এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ এই আইনগুলির মধ্যে দিয়ে এর অনেক পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমান বিধানসভা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ৯ জুল ই ১৯২৮ এবং উদ্বোধন হয় ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপক ও উদ্বোধক দুইই ছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন গভর্ণর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। স্থপতি ছিলেন জে গ্রীভস এবং তৈরী করেছিলেন মার্টিন এ্যাণ্ড কোং।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথম অধিবেশন বসে ২১ নভেম্বর ১৯৪৭ এবং ঈশ্বরদাস জালান স্পীকার নির্বাচিত হন, ডঃ পি সি ঘোষের নেতৃত্বে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ডঃ ঘোষ ২৩ জানুয়ারী ১৯৪৮ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হন ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ২৩ জানুয়ারী ১৯৪৮। স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। নির্বাচনের পর ৩১ মার্চ ১৯৫২ পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিধানসভা সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। এর প্রথম অধিবেশন বসে ১৮ জুন ১৯৫২ এবং ২০ জুন ১৯৫২, শৈল মুখার্জী এই বিধানসভার প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন। বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪০, তার মধ্যে ২৩৮ জন নির্বাচিত সদস্য এবং গভর্ণর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় থেকে ২ জন সদস্যকে মনোনীত করেন।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী ৫১ জন সদস্য বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ গঠিত হয় ৫ জুন ১৯৫২। ১৮ জুন এর প্রথম অধিবেশন হয় এবং ১৯ জুন ১৯৫২ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২১ মার্চ ১৯৬৯ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অবলুপ্তির জন্য একটি প্রস্তাব পাশ হয় এবং সেই অনুযায়ী পার্লামেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ (অবলুপ্তি) আইন পাশ হয় এবং ১লা আগষ্ট ১৯৬৯ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ অবলুপ্ত হয়।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ১লা জুলাই ১৯৬২ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত যারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তাঁদের নাম ও কার্যকাল নীচে দেওয়া হলো।

| মুখ্যমন্ত্রীদের নাম | মেয়াদ |
|---|---|
| ডঃ পি. সি. ঘোষ | ২১ নভেম্বর ১৯৪৭ থেকে ২৩ জানুয়ারী '৪৮ পর্যন্ত |
| ডঃ বিধানচন্দ্র রায় | ২৩ জানুয়ারী ১৯৪৮ থেকে ১ জুলাই '৬২ পর্যন্ত |
| প্রফুল্লচন্দ্র সেন | ২ জুলাই ১৯৬২ থেকে ১ মার্চ '৬৭ পর্যন্ত |
| অজয় মুখার্জী | ২ মার্চ ১৯৬৭ থেকে ২১ নভেম্বর '৬৭ পর্যন্ত |
| ডঃ পি. সি. ঘোষ | ২১ নভেম্বর ১৯৬৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী '৬৮ পর্যন্ত |
| অজয় মুখার্জী | ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ থেকে ২৬ মার্চ '৭০ পর্যন্ত |
| অজয় মুখার্জী | ২ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ২৮ জুন '৭১ পর্যন্ত |
| সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় | ২০ মার্চ ১৯৭২ থেকে মার্চ '৭৭ পর্যন্ত |
| জ্যোতি বসু | ২১ জুন ১৯৭৭ থেকে |

নিজের দেশকে সঠিক এবং সম্পূর্ণভাবে জানবার জন্য 'দেশের কথা' বিভাগ। আমরা এখানে এক এক সংখ্যায় এক একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথম সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা প্রকাশিত হ'লো। তোমরাও যে যে বিষয় জানতে চাও লিখে জানাও। এক একটা বিষয় নির্বাচন করে নিজেরাও লিখে পাঠাতে পারো।

# কালো মাণিকের ডায়েরী

রচনা ঃ আন্না স্যুয়েল

অলংকরণ—রুডি নোব্রেস

ভাষান্তর—অর্জুন দাস

চিত্র বিন্যাস ঃ রতন মুখোপাধ্যায়

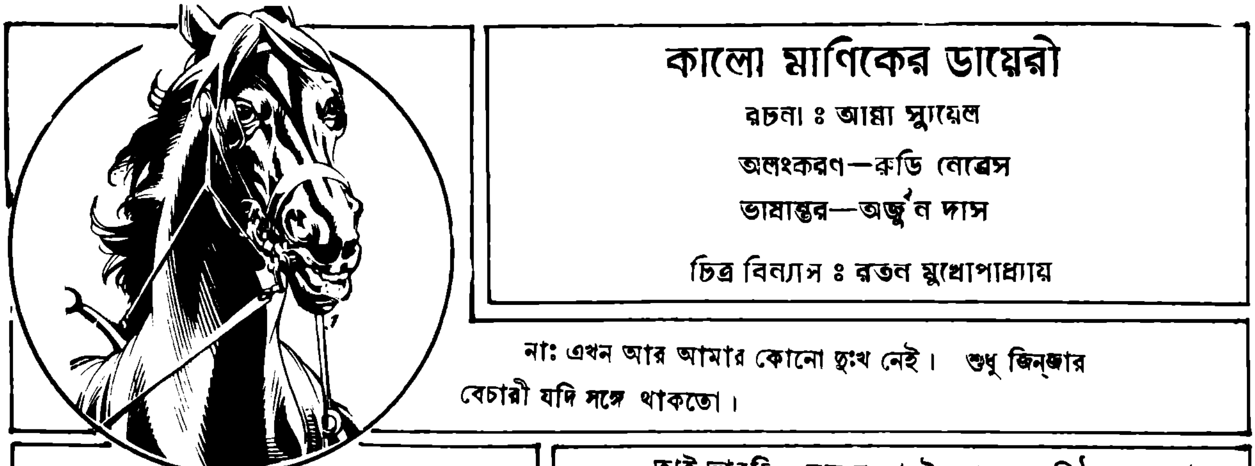

তখন অবশ্য ঘাস খেতে শিখিনি মায়ের দুধ খাই, মার কাছে কাছে থাকি।
কখনও দৌড় ঝাঁপ করে বেড়াই অন্য বাচ্চা ঘোড়ার সঙ্গে। আবার কখনও মারামারি লাফালাফি চলে নিজেদের মধ্যে।
এমনি একদিন খুব একচোট লাফালাফি চলছে, মা ডাকলেন—চিঁহিঁ হিঁহিঁ চিঁহি।
কাছে যেতে মা আদর করে বললেন অনেক যত্নে ভালোঘরের মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে তোমায়।"
"তোমায় ঠাকুর্দা দু'বছর নিউমার্কেটের দৌড়ে কাপ জিতেছিলেন।
"তোমার ঠাকুরমা ছিলেন ভারী মিষ্টি মেজাজের মেয়ে আমাকেও তুমি কখনো লাথি ছুঁড়তে বা কামড়াতে দেখনি।"
সত্যি! আমাদের কর্তা বড় ভালো বড় দয়ালু মানুষ ছিলেন। খাওয়া থাকার কি সুব্যবস্থাইনা ছিল। তাঁর কথাবার্তায় স্নেহ ঝরে পড়ত যেন।
"কি গো! মহারাণী, আজ তোমার বাচ্চা আছে কেমন?"
"তাই বলছি শান্ত হও। মন দিয়ে নিজের কাজ করতে শেখো। দৌড়ের সময় ভালো করে পা তুলে দৌড়বে। কামড়াবে না, বা লাথি চালাবে না মোটে।"

একদিন একটা খাচ্চা ঘোড়াগুলোকে ঢিল মেরে
দৌড় করাবার ধান্ধায় দিল, কর্তা ধরে ফেললেন।
"দুষ্টু ছেলে ! আর কখনও আমার খামার বাড়ি না দেখি তোমায়।'
আমার যখন দু'বছর বয়স, তখন আমরা একদিন শিকারী কুকুরের ডাক শুনাতুম।
"ওরা খরগোশ শিকারে বেরিয়েছে। এদিকে এলে শিকারের কায়দা দেখতে পাব আমরা।"
ভৌঃ — ভুঃ ভুঃ
আমি অবাক হয়ে দেখলুম—শিকারীরা কেমন বাঁধের ওপর থেকে ঘোড়াশুদ্ধ ঝাঁপ দিয়ে নদী পার হয়ে টগবগিয়ে মাঠের ওপর চলে এল।
মাঠের এপারে এসে একটা উঁচু বেড়া টপকে গেল ওরা।

হঠাৎ একটা ঘোড়া সওয়ারকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কেউ আর নড়ে না।
যুবকটিকে ওরা তুলে নিয়ে গেল, আর পশু চিকিৎসক এলেন ঘোড়াটিকে দেখতে।
পশুচিকিৎসক বললেন—'পা ভেঙে গেছে'। তারপর একটা কানফাটা আওয়াজ। ব্যস্, স্থির হয়ে গেল ঘোড়াটা, চিরকালের মত।
মাকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল। বললেন—"সামান্য একটা খরগোশ! কত সহজে ধরা যায়! কেন যে মানুষ এমন হুল্লোড় ভালবাসে!"
ক'দিন না যেতেই আমরা একটা অদ্ভুত কালো গাড়িকে যেতে দেখলুম। .. সেই যুবকটিকে ওরা কবর দিতে নিয়ে গেল।
কর্তা বলতেন—বাচ্চা ঘোড়াকে জওয়ানদের মত খাটান উচিত নয়। আমাকে তাই চার বছর বয়স পর্যন্ত বিক্রী করেন নি।

# ধাঁধা

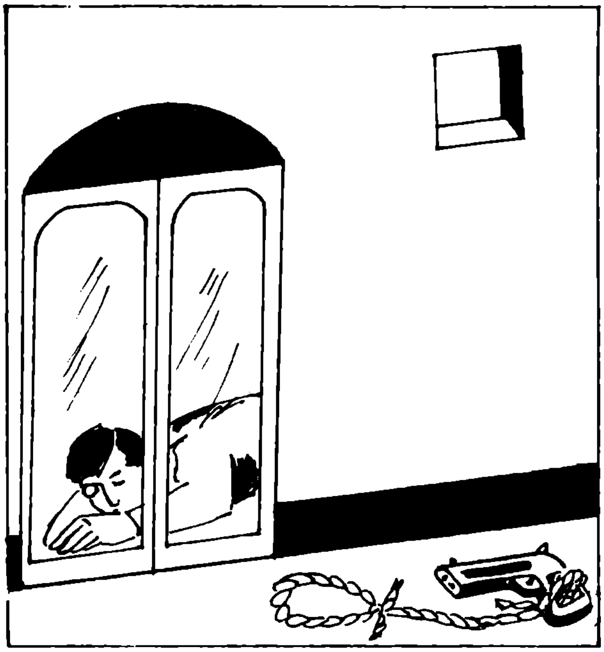

কাঁচের দরজাটি বন্ধ। ওপাশে দেখা যাচ্ছে একজন লোকের মৃতদেহ। রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেছে লোকটি। কারণ তার ঘরের ঐ দরজা ছাড়াও বাকি সব জানালাও বন্ধ রয়েছে ভেতর থেকে। এ মত অবস্থায় আত্মহত্যা ছাড়া কি-ই বা হতে পারে।

কিন্তু তাহলে একটা বিরাট প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে, যেমন—যদি রিভলবার দিয়েই আত্মহত্যা করে লোকটি তাহলে সেই রিভলবার কি করে ঘরের বাইরে এলো? অবশ্য একটা ব্যাপার, যেখানে রিভলবারটি পড়ে আছে তার ঠিক উপরেই রয়েছে একটি ভেন্টিলেটর। তাহলে কি রিভলবারটি ঐ আত্মহত্যাকারী নিজেকে গুলি করার পর ছুঁড়ে ফেলেছে ঐ ভেন্টিলেটর দিয়ে ঘরের বাইরে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

যদি তাইবা হয় তাহলে ঐ রিভলবারটির সাথে কেন বাঁধা রয়েছে একটি দড়ি যার শেষ প্রান্তে রয়েছে একটা ফাঁস?

ধাঁধার উত্তর ৪৮ পাতায়

প্রণব হোড়

# শব্দ নিয়ে খেলা

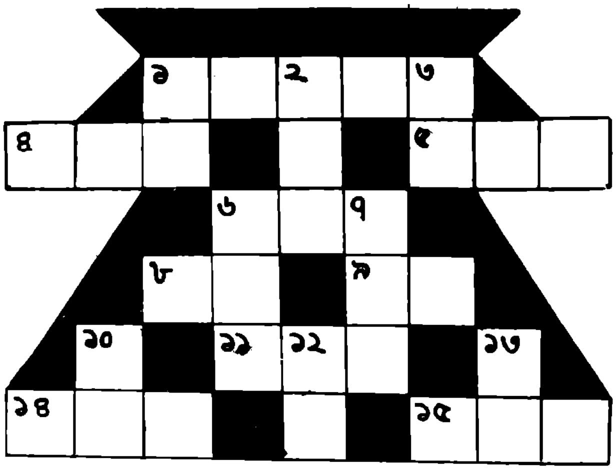


### পাশাপাশি

১। ইতিহাসের এক বিরাট নায়ক।
৪। সূর্যের অপর নাম।
৫। আলো জ্বলে যাতে।
৬। মৃত্যুর পর পাপীদের স্থান।
৮। দেহের উপরের আচ্ছাদনী।
৯। দামী পাথর বিশেষ।
। চঞ্চল যে ভীষণ।
১৪। বসবার জন্য ব্যবহৃত
১৫। টুং টুং শব্দে যে যন্ত্র বাজে

### উপর নিচ ঃ—

১। যিনি নেতৃত্ব দেন।
২। দেহের এক গ্রন্থি বিশেষ।
৩। কুল কুল করে যে বয়ে চলে।
৬। দক্ষিণ ভারতের একটি নদীর নাম।
৭। পদ্মফুলের অপর নাম।
১০ মাটির তলার ফল।
১২। প্রশস্ত ময়দান।
১৩ মনের অপর নাম।

উত্তর পরের সংখ্যায়।

ধ্রুব ভট্টাচার্য

## গল্প প্রতিযোগিতা

কিশোর সঙ্গী প্রথম সংখ্যা থেকেই গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। যারা গল্প লিখতে এবং পড়তে ভালবাস তাদের কাছে এ সংবাদ নিশ্চয়ই আনন্দের। তোমরা যে কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গল্প লিখে পাঠাতে পারো। আমরা শ্রেষ্ঠ তিনজন গল্প লেখকের প্রত্যেককে ২৫ টাকা করে পুরস্কার দেব। পুরস্কৃত গল্পগুলি কিশোর সঙ্গীতে প্রকাশিত হবে। তিনটি পুরস্কারের মধ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীকে একটি, নবম ও দশম শ্রেণীকে একটি এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীকে একটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

নিয়মাবলী

১। সাত শত শব্দের মধ্যে গল্প লিখতে হবে।

২। রুল টানা কাগজের এক পিঠে গল্প লিখতে হবে।

৩। পত্রিকা প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সম্পাদকীয় দপ্তরে গল্প পৌঁছানো প্রয়োজন।

৪। নীচের কুপনটি পূরণ করে গল্পের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

নাম............

বয়স.... ...... শ্রেণী

ঠিকানা

.......................

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম

.... ......................... ... ....... ... ... ....

## ছড়া পড়ো ছড়া লেখো

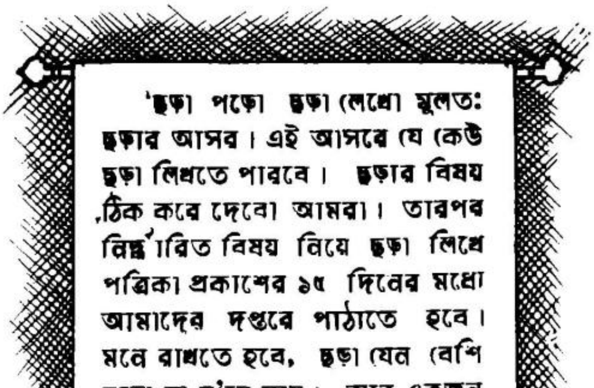

'ছড়া পড়ো ছড়া লেখো' মূলতঃ ছড়ার আসর। এই আসরে যে কেউ ছড়া লিখতে পারবে। ছড়ার বিষয় ঠিক করে দেবো আমরা। তারপর নির্দ্ধারিত বিষয় নিয়ে ছড়া লিখে পত্রিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পাঠাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ছড়া যেন বেশি বড়ো না হ'য়ে যায়। আর একজন একটি ছড়াই পাঠাতে পারবে।

ছড়ার বিষয় ঃ কলকাতা

যে সব ছড়া পড়ে আমাদের ভালো লাগবে সেগুলি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। পাঠাবার সময় খামের উপর লিখে দিতে হবে 'ছড়া পড়ো ছড়া লেখো'।

ঠিকানা

সম্পাদক : কিশোর সঙ্গী

৭৯, কলুটোলা ষ্ট্রিট, কলি-৭০০ ০৭৩

## ধাঁধার উত্তর

ব্যাপারটা কিছুই না। মৃত লোকটি আত্মহত্যা করার পূর্বে ভেবেছিল একটু রহস্যপূর্ণ ভাবে সে মারা যাবে। তাই সে ঘরের ভিতরে ঢুকে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দেয় প্রথমে। তারপর একটি দড়ি নিয়ে তার একপাশে বাঁধে রিভলবার এবং অপর পাশে বাঁধে বেশ কিছুটা ওজনের বরফের চাঁই। এবার সে বরফ খণ্ডটুকু দেওয়ালের ঐ গর্তের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দেয়। তারপর নিজের বুকে বন্দুক রেখে টি গার টেপে। বলা বাহুল্য সে মাটিতে পড়ে যায় এবং হাত থেকে রিভলবারটা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু বরফ খণ্ডের ওজন রিভলবারের চাইতে বেশী ছিল সেহেতু খণ্ডটি রিভলবারকে টেনে বাইরে নিয়ে এসেছে এবং মাটিতে পড়েছে।

অনেকক্ষণ সময় কেটে গিয়েছে বলে বরফটি আর নেই। সেটি গলে গিয়েছে।

# হাসাহাসি

এই বন্ধু ট্রাম Stopage এ দাঁড়িয়েছিল। ট্রাম আসতেই একবন্ধু দৌড়ে গিয়ে Second Class এ উঠলো। আর এক বন্ধু First Class এ উঠলো। ধর্মতলায় নেমে প্রথম শ্রেণীর বন্ধুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুকে প্রশ্ন করলো তুই হঠাৎ ছুটে গিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলি কেন?

বন্ধুটি উত্তর দিল—তোর মতন বোকা নইত আমি, ভেবে কাজ করতে হয়।

'কেন এতে আবার বোকা চালাকের কি হল?'

বিদ্যুৎ সরবরাহের হোঁচকা কলটাত সেকেণ্ড ক্লাসের মাথার উপর। তোর ফাস্ট ক্লাস না পৌছলেও সেকেণ্ড ক্লাস পৌছবেই।'

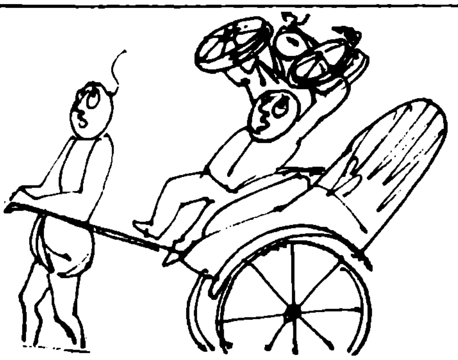

এক ভদ্রলোকের মোটর বাইক হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল রাস্তায় যেতে যেতে। একটা রিকসা ডেকে বল্লেন—এই গাড়ীটা নিয়ে শিয়ালদা যাবো কত নিবি?

রিকসাওলা বল্লে দশ টাকা।

ভদ্রলোক গাড়ীটা রিকসার উপর তুলে নিয়ে বসলেন। কিছুদূর যাবার পর রিকসাওলা বল্লে—বাবু বহুৎ ভারী লাগতা। ভদ্রলোক বল্লেন—ও ভারী লাগছে এই বলে গাড়ীটা দু'হাতে চাগিয়ে উপরে তুলে ধরে বল্লেন—এবার চল্।

ভূগোলের শিক্ষক দেয়ালে Map টাঙিয়ে বিমলকে ডেকে বল্লেন—এই Map এর মধ্যে আমেরিকা কোথায় দেখাও। বিমল ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে চলে গেল। এবার ঘনাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—আমেরিকা আবিষ্কার করেছে কে? ঘনা উত্তর দিল—কেন স্যার বিমল।

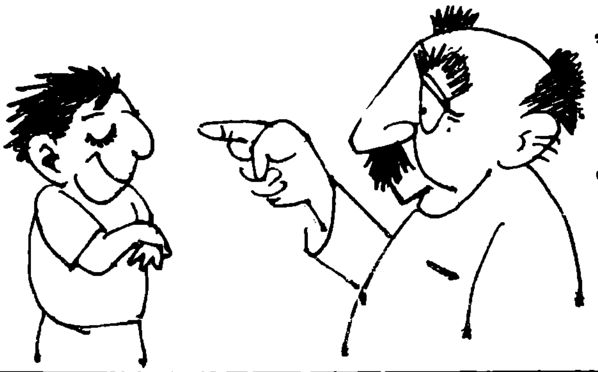

রমেন। শিক্ষকমশাই ডাকলেন।

বলুন স্যার।

আমিত শুনেছি প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য তোমার পৃথক পৃথক মাষ্টারমশাই আছেন।

হ্যাঁ স্যার

আর তুমিত দেখছি সব সাবজেক্টেই পাস করেছ কিন্তু এগ্রিগেটে ফেল করেছ। এটা খুব দুঃখের বিষয়।

তাহলে কি করবো স্যার?

তোমার বাবাকে বল এগ্রিগেটে পড়াবার জন্য একজন মাষ্টার রাখতে।

অতীন বসু

# ক্যুইজের আসর

## পরিচালনায় ঃ ক্যুইজ মাষ্টার

১। ভারতবর্ষের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল কে?

২। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভানেত্রীর নাম কি?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় কবে?

৪ পিকিং শহরের নতুন নাম কি?

৫। মিচিগান হ্রদ কোথায় অবস্থিত?

৬। উড়োজাহাজ আবিষ্কার হয় কোন বছর?

৭। পারদের সংকেত কি?

৮। আলেকজাণ্ডার গ্রাহামবেল কোন দেশের বিজ্ঞানী?

৯। ১৯৮২ সালে বাস্কেটবল খেলায় অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয় কাকে?

১০। ক্লাইভ লয়েড কোন দেশের খেলোয়াড়?

১১। কার্ল লুইস ১৯৮৪ ওলিম্পিকে কোন কোন ইভেণ্টে স্বর্ণ পদক লাভ করেন?

১২। 'Lion of Punjab' কাকে বলা হত?

১৩। 'Earth' বইটি কার লেখা?

১৪। পাশের ছবিটি কার?

**উত্তর পরের সংখ্যায়**

**ক্যুইজের আসরের উত্তর পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই। দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তর দাতাদের নাম আমরা প্রকাশ করবো। সবকটি প্রশ্নের উত্তর যারা দিতে পারবে লটারীর মাধ্যমে তাদের মধ্যে একজনকে ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।**

# জানো কিনা জানিনা

১। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি ভাইস-চ্যান্সেলার কে হয়েছিলেন?

২। আগে যে শহরটির নাম ছিল 'মৎস', এখন সেই শহরটির নাম কি?

৩। 'ভ্যাটিকান সিটি' নামক দেশটির প্রচলিত মুদ্রার নাম কি?

৪ 'ড্রাকমা', 'মিপেছেতা' এবং 'ফ্লোরিন' কোন কোন দেশের মুদ্রা?

৫। 'ম্যারাথন রেস'-এর উৎপত্তি কীভাবে?

৬। 'প্রাচ্যের লিভারপুল' কাকে বলে?

৭ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র কোন্ দেশটি?

৮। কোন্ জায়গায় সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়?

৯। 'কোহিনুর' হীরক কোন্ খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল?

**উত্তর**

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২। জয়পুর।

৩। লীরা।

৪। 'ড্রাকমা' হল গ্রীসের মুদ্রার নাম, 'মিপেছেতা' স্পেন এবং 'ফ্লোরিন' হল্যাণ্ডের মুদ্রার নাম।

৫। গ্রীসে ফিডিপাইডিস নামে একজন দৌড়-বীর একটানা ২২ মাইল দৌড়িয়ে ম্যারাথন যুদ্ধ জয়ের খবর প্রথমে গ্রীসে পৌঁছে দেন এই খবর দিয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান সেই থেকে 'ম্যারাথন রেস'-এর উৎপত্তি হয়। বর্তমানে এই রেসে ২৬ মাইল ৩৮'৫ গজ দৌড়োতে হয়।

৬। সিঙ্গাপুর বন্দরকে।

৭। ভ্যাটিকান সিটি। আয়তন ১০৮.৭ একর।

৮। জাভা দ্বীপে।

৯। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের প্রিটোরিয়ার প্রাচীনতম হীরকের খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

বিদ্রোহেন্দ্রনাথ চন্দ

# সুরসুনা উচ্চ-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ল্যাবরেটরী

যারা স্কুল বা কলেজে পড়ো তাদের নিজস্ব বিভাগ এটি। তোমরা তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী ল্যাবরেটরীর বিবরণ, সমস্যার কথা ছবিসহ লিখে পাঠাও।

পায়ে পায়ে হাজির হয়েছিলাম ১২৫ বছরের পূর্তি উৎসবের আয়োজনে চলছে এমন একটি বিদ্যালয়ে। মূল কলকাতা শহরের হাজার ব্যস্ততা থেকে মাত্র ১৪ কি. মি. দূরে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই বিদ্যালয়টি। যার নাম সরসুনা উচ্চ বিদ্যালয়। উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কিছু খোঁজ খবর সংগ্রহ করা। বিদ্যালয়ে একদিকে যেমন ১২৫ বছর পূর্তি উৎসবের আয়োজন, তেমনি পাশাপাশি বার্ষিক পরীক্ষাও চলছে। কিছুটা এগোতেই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। আলাপ করলাম। সে নাম জানালো, কুমারী বেলা সাহা। সে দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্রী। গ্রন্থাগার সম্পর্কে জানতে চাইলে সে জানালো, আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংগ্রহ যে কোনো বিদ্যালয়ের থেকে তুলনামূলক ভাবে উচ্চ মানের। গল্পের বইয়ের সংগ্রহ সুনির্বাচিত এবং ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী। কিন্তু তার আক্ষেপ—বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকারী গ্রন্থ সংগ্রহ খুবই ভালো। সে তুলনায় কলা ও বাণিজ্য বিভাগের গ্রন্থ সংগ্রহ খুবই দুর্বল তার মতে একটা Reading Room-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ বর্তমানে সেটা নেই। যার ফলে Off Period-এ ছাত্র-ছাত্রীদের অযথা সময় নষ্ট হয়।

তাছাড়া সে জানালো, বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬০০০-এর উপর বই। তার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রায় ২,৫০০ এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে এনসাইক্লোপেডিয়াও আছে।

ল্যাবরেটরী

সুরসুনা উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে ল্যাবরেটারী বিষয়ে।

জনৈক ফিজিক্স-এর ছাত্র জানালো, আধুনিক একটা ল্যাবরেটারীর যা যা থাকা দরকার যেমন, স্লাইড ক্যালিপার্স, স্ফেরোমিটার, লেন্স এবং ব্যাটারী ( সেল ) এখানে সবগুলিই আছে এবং আমাদের প্রয়োজনে লাগছে।

জনৈকা কেমিস্ট্রি বিভাগের ছাত্রী জানালো, একটি ভালো ল্যাবরেটারীর জন্য প্রথমেই দরকার ভালো ভেন্টিলেশন, এ্যালকোহল, বেসিন, বুনসেন বার্ণার এবং পরিশ্রুত জল ( Distilled Water )। এসবই আমাদের বিদ্যালয়ে আছে।

বায়লোজী বিভাগের জনৈক ছাত্র জানাল, অঞ্চলের সহযোগিতা খুব কাজে লেগেছে আমাদের। যেমন; মাইক্রোস্কোপটি একজন উপহার দিয়েছে এ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যেমন; ছুরী, কাঁচি, স্লাইড গ্লাস ছুঁচ প্রভৃতি খুব উপযোগী ও উচ্চমানের।

বিদ্যালয় থেকে বেরোনোর সময় কেবলই মনে হচ্ছিল, এই রকম ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সুহৃদ সম্পর্ক বজায় রেখে কেন পশ্চিমবঙ্গের অবহেলিত বিদ্যালয়গুলো এগোচ্ছে না।

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

# দুই পড়ুয়ার কথা

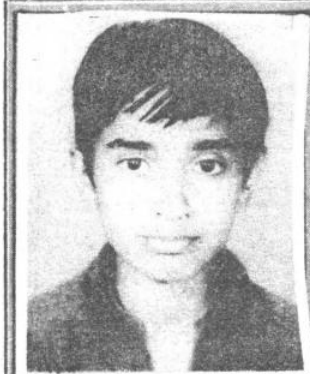

পড়াশুনোয় ফাঁকি? এজন্য-সব মা-বাবারা বলেই থাকেন। আমি ফাঁকি-টাকি দিই না। বরং বলা ভাল, কম পড়ি। দুপুরে পড়তে আমার একদম ভাল লাগে না। পড়ার বাঁধা-ধরা সময়ও নেই আমার। ক্লাসের পড়া রোজেরটা রোজ করি। আবার সে পড়া পড়ি পরীক্ষার ঠিক আগে, এর মধ্যে নয়। ভৌত-বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয়। ইতিহাসে ভীষণ ভয়। এত রাজা, এত যুদ্ধ আর অগুণিত সন-তারিখ কার সাধ্যি মনে রাখে।

নবারুণ গোস্বামী। বিরাটি হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। এবার ক্লাসে উঠেছি ৭০ শতাংশ মার্কস্ পেয়ে। হাসি-হাসি মুখ নিয়ে বলে গেল কথা-গুলো। শীতের রোদে বারান্দায় বসে মধ্যাহ্ন সূর্যের চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় নবারুণের একটু অসুবিধাই হচ্ছিল কথা বলতে। সকাল কি সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে পৌঁছতে ওর বেশ দেরি হয়ে যায়। অবশ্য এই বদভ্যাসটির জন্যেও নিজেই লজ্জিত!

নবারুণ একমাত্র ক্রিকেট খেলতেই ভালোবাসে। তবে কোনো বড় খেলোয়াড়কে নকল করে না ও, নিজের মতোই খেলে। আর ক্রিকেট এত প্রিয় বলেই শীত ওর মিত্র। শখ বলতে স্ট্যাম্প কালেক্‌শন। দেশ-বিদেশের পাঁচশ-র উপরে টিকিট রয়েছে ওর সংগ্রহে। বিড়াল পুষতে ভালবাসে। একবার কুকুরে কামড়েছে বলেই হয়তো 'ঘেউ' ডাকটি ওর বড়ই অপছন্দ। স্কুলে নবারুণের সে-সব মাস্টার মশায়-দেরই ভাল লাগে যাঁরা পড়াটা খুব ভাল বোঝাতে পারেন এবং যাঁরা ছাত্রদের না মেরেই কেবলমাত্র উপস্থিতি দিয়ে তদের শান্ত ও বাধ্য রাখেন। ক্লাসে ওর একমাত্র বন্ধুর নাম না জানিয়েই বলল, ওর ব্যবহারটাই আমার ভাল লাগে, রেজাল্ট আমার কাছাকাছি না হলেই-বা। কাজ বলতে, নবারুণকে মাঝে মাঝে রেশন তুলতে হয়। তবে কাজের কথা ভুলে যেতে ওর ভালই লাগে। ভূতের ভয়? আগে ছিল, এখন নেই। ভূত ঠিক নয় আত্মা রয়েছে বলে ওর ধারণা। শার্লক হোমস্ ও সত্যজিৎ রায়ের বই পড়েছে কয়েকটা। ইন্দ্রজাল কমিকস পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করাই অন্যায় বলে মনে হল। হাতের লেখাটা ওর বড্ড খারাপ। সেজন্যে মাথা-ব্যাথাও নেই। তবলা শেখে। নজরুলগীতি ভালবাসে। পাতা-ভর্তি খালি রাজ-নৈতিক খবর থাকে বলেই খবরের কাগজ পড়তে ওর কেমন কেমন লাগে। রেডিও তে খেলা শোনে মাত্র। বাড়িতে অতিথি এলে মন নেচে ওঠে নতুন হাওয়ায়।

'কিশোর সঙ্গী'কে সঙ্গী পেতে নবারুণ দারুণ আগ্রহী।

২

মেয়েটি একটু অন্যরকম বলে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীরা ওকে সবসময়ই বিরক্ত করতো। সেদিন এই জ্বালাতনের পরিমাণ সীমা ছাড়িয়ে যেতে আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ভয়ঙ্কর রাগের সঙ্গে নিজের সহপাঠীদের বিরোধিতা করেছিলাম। — সুমনা ভট্টা-চার্য্যের কথা। নর্থ দমদম বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস্ এর ক্লাস টেনের ছাত্রী। এবার ক্লাসে উঠেছে ৬৭ শতাংশ মার্কস্ পেয়ে। সপ্রতিভ কিন্তু ছটফটে নয় এবং ভাবুক ও আদর্শ-অনুসারী, এভাবে বর্ণনা করলে সুমনা কি খুশি হবে? অনেকগুলো বিষয়েই ফলাফল একরকম হলেও ইতিহাসের প্রতিই ও বেশি অনুরক্ত। এমন কী ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসও ওর পড়তে ভীষণ মজা লাগে। সুমনার কাছে রাত্রিবেলাটাই পড়াশুনার সময়। তবে পড়াশুনার সময় বাড়াতে হলে সকাল বেলাটাকেও কাজে লাগাতে হবে, এটাও বুঝতে পারে। বই পড়া ও বই সংগ্রহ ওর একমাত্র শখ। প্রতিবারই বই–মেলাতে গিয়ে গাদাগাদা দেশী-বিদেশী বই কেনে। নিজের জমানো পয়সা বই কেনার পেছনেই ব্যয় করে। প্রিয় লেখক সত্যজিৎ, শরদিন্দু, জুলে ভার্ন, দানিকেন প্রমুখ। এ থেকে সুমনাকে ঘরকুনো ভেবে নেওয়া ভুল হবে। স্কুলের হয়ে কাবাডি, কুইজ, আবৃত্তি, নাটক প্রভৃতি প্রতি-যোগিতায় অংশ নিয়ে ও সফলও

হয়েছে। ভ্রমণ আর ভ্রমণকাহিনী লেখা ( স্কুল ম্যাগাজিনে ) মাঝেমধ্যে ওকে পেয়ে পেয়ে বসে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে এমন স্থানে বেড়াতে যাওয়াই সুমনার আগ্রহ। ওর প্রিয় ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায়। আসলে সত্যজিৎ রায়ের গম্ভীর মুখ-চিত্র, লেখার স্টাইল আর কাগজে ছাপা তাঁর মাপা কথা থেকে ও এই সিদ্ধান্তে এসেছে। মনে গেঁথে থাকা কোনো পংক্তি জানতে চাইতেই সুমনার মনের দোতারায় যেন বেজে উঠলো—'জন্মিলে মরিতে হবে অমর সে কোথা কবে' আর 'জন্মেছিস যখন একটা দাগ রেখে যা', পরপর দু'টি পঙক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ ওর আদর্শ পুরুষ। অরিজিৎ, তন্নিষ্ঠা, শুচিস্মিতা—এরা সবকি সুমনার বন্ধু? না-না, এই নামগুলো ওর প্রিয়। সুমনার বার্থ-সার্টিফিকেট থেকে শুরু ক'রে সব রকমের দরকারী কাগজপত্র ওর নিজ দায়িত্বেই সংরক্ষিত রয়েছে ভিন্ন একটা ফাইলে। ও নিয়মিত ডাইরী লেখে। ইচ্ছে থাকলেও ঘরের কাজে মা-কে সাহায্য করা হয়ে ওঠে না। ভাললাগে কুকুর পুষতে, শুধু শুধু ঝাল নুন আর ডালমুট খেতে. এমনকী কিরো-র বই প'ড়ে হাত দেখতেও। অপছন্দ বলতে, রাস্তার কল থেকে অহেতুক জল-পড়া আর সিনেমা দেখা। ওদের স্কুলে চালু আছে সেই নিয়মটি যাতে স্কুলের ভেতর কোনো ছাত্রীকেই 'মার্কসীট' খুলে ফলাফল দেখতে দেওয়া হয় না। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, শেষে সুমনার জিজ্ঞাসা—'কিশোর সঙ্গী' কবে বেরোবে?

শুভাশিস হালদার

# টুকিটাকি

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটো ভাই ছিলেন ডাক্তার। তাঁরা থাকতেন ছোটো টালির বাড়ীতে। দাদার কাছে অনেক লোকজন আসেন। একবার তিনি হাজার পনেরো টাকা জমিয়ে ফেলেন। তা একদিন তিনি দাদাকে ব্যাপারটা বললেন। আরও বললেন আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে একটা ভাল বাড়ী করতে পারি। তখন বিভূতি-ভূষণ বললেন দেখ সুন্দর বাড়ী করলেই ইচ্ছা হবে তাকে ভাল ভাল আসবাবপত্র দিয়ে সুন্দর করে সাজাতে। মন সবসময় সেখানে পড়ে থাকবে—তারপর কে কোথায় নোংরা করল অনবরত সেইসব দিকে নজর যাবে। কারও বাড়ীতে ভাল কিছু দেখলেই মনে হবে কতক্ষণে আমারও এরকম হবে। রোগীদের সম্বন্ধে চিন্তাভবনা করার অবকাশ কমে যাবে। কাজেই সেটা খুব অন্যায় হবে। বরং যে টাকাটা জমেছে সেটা দিয়ে হসপিটালে একটা বেড করে দে।

একবার কি একটা সম্মেলন উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম ফরিদপুরে গেছেন। সেখানে তিনি কবি জসীম-উদ্দিনের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন। জ্যোৎস্নারাতে বাঁশবাগানে মাদুর পাতা হয়েছে, সেখানে বসেছে গানের আসর। নজরুল একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন। সেই কিষাণ এ পাড়া ও পাড়া থেকে অনেকেই এসেছে। তারাও নজরুলের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। হঠাৎ নজরুলের ইচ্ছা হল চা খাবার কিন্তু তখন গ্রামে চায়ের এত চল ছিল না। জসীমউদ্দিন খুব মুশকিলে পড়লেন, কোথায় চা পাওয়া যায়। পদ্মার ওপারে শহর আছে বটে. কিন্তু এত রাতে পদ্মা পেরোবে কে। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজনের বাড়ী থেকে কটা চায়ের পাতা পাওয়া গেল। নজরুল তো খুব খুশী। কিন্তু আর এক সমস্যা। চা তৈরী হবে কিভাবে? তখন এ বাড়ী. ও বাড়ীর মেয়ে বৌ সবাই মিলে নানা পদ্ধতি খাটিয়ে সেই চা তৈরী করল। নজরুল নিজে খেলেন। সবাইকে একটু একটু দিলেন। চলল গানের আসর।

গৌতম ঘোষ

# গোল্ডেন বয় গাওয়ার

একটি ছোট্ট ছেলে। তার ছেলেবেলা থেকে খেলোয়াড় হওয়ার ইচ্ছা। বড় ক্রিকেটারের স্বপ্ন তার মনে। এক সময় পড়াশুনার চেয়ে ক্রিকেটকে সে বেশী ভালবেসে ফেলেছিল। ক্রিকেটের প্রতি ছেলের এই আকর্ষণ দেখে বাবা মুগ্ধ না হয়ে পারেন? শুধু বাবা নয়, মাও তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন সেই ছোট বেলা থেকে। মা-বাবার এগিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা ছেলেকে আরো বড় হতে স্বপ্ন দেখিয়েছে। ভাবতে শিখিয়েছে বিশ্বের সর্বকালের সেরা বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ক্লাডক উলি, নীল হার্ভে, বার্ট সাট ক্লিফ, ক্রিকেটের কবি নেভিল কার্ড সদের মত হওয়া। ক্রিকেটের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়লেও পড়াশুনায় তেমন ফাঁকি ছিল না। খেলাধুলা আর পড়াশুনা তাই সমান ভাবে এগিয়ে চললো। কঠিন সাধনা।

এতক্ষণ যে ছেলেটিকে নিয়ে এত ভূমিকা তিনি হলেন ডেভিড গাওয়ার এবারে আমাদের শীতের অতিথি ষোল সদস্যের ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ডেভিড ইভন গাওয়ার। ভারতে এটি তাঁর তৃতীয় সফর। তিনি এদেশে প্রথম এসেছিলেন সেই ১৯৮০ সালে মাইক ব্রিয়ারলির দলের সঙ্গে ক্রিকেটোল বোর্ডের সুবর্ণ জয়ন্তী টেষ্ট খেলতে বোম্বাই এ। দ্বিতীয় বার '৮১-'৮২ মরশুমে এসেছিলেন কিথ ফ্লেচারের দলের সঙ্গে পূর্ণ সফরে।

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল ইংলেণ্ডের টান ব্রিজ ওয়েলস শহরে গাওয়ারের জন্ম। প্রায় ছ' ফুট ছুঁই ছুঁই দীর্ঘ মেদহীন ও ঋজু দেহ, মুখে সব সময় লেগে থাকা মিষ্টি হাসি, মাথায় একরাশ কোঁকড়ালো সোনালী চুল, দুটি ডাগর ডাগর চোখ প্রথম দেখায় ভালবাসতে মন চাইবে।

## সাজাহান সিরাজ

সাতাশ বছরের এই তরুণ বাঁ-হাতি ক্রিকেটারের টেস্ট জীবনে অভিষেক ১৯৭৮ সালে স্বদেশ ভূমিতে এজবাসটন মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

ওই বছরেই তিনি ইয়ং ক্রিকেটারের সম্মান এবং উইসডেন-এ ফাইভ ক্রিকেটারস অফ দ্য ইয়ার হওয়ার সম্মান পান। এতদিনে ছোট্ট ছেলেটির কঠিন সাধনা সার্থক হয়। মূলতঃ এই সম্মানই ডেভিড গাওয়ারের টেষ্ট ক্রিকেটের মূল চাবিকাঠি। এজবাসটনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেক টেষ্টে তিনি ৫৮ রাণের একটি সুন্দর ইনিংস দর্শকদের উপহার দেন।

ডেভিড গাওয়ার এ পর্যন্ত সাত বছরে খেলেছেন ৬৭টি টেষ্ট। ১১৩টি ইনিংসে তিনি দশবার নক আউট থেকে রান পেয়েছেন ৪৮৮৬। এর আগে স্বদেশের তেরজন এবং বিশ্বের ৩৪ জন ক্রিকেটার এই চার হাজার রান রেকর্ডের খাতায় নিজেদের নাম লিখেছেন তাঁর রানের গড় ৪৩'৫৫। ৪৩ বার দুরন্ত বলকে তালু বন্দী করে ৪৩ জন নামি অনামি ব্যাটসম্যানকে তাঁবুতে ফিরিয়েছেন। নিজে ছ'বার শূন্য হাতে তাঁবু ফিরিয়েছেন। তাঁর ৬৫টি টেষ্টের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছেন ১৬টি টেষ্ট। রান পেয়েছেন ৮৩২। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর সবচেয়ে বড় অঙ্কের টেষ্ট রান ভারতের বিরুদ্ধে নট আউট ২০০, যা তিনি ১৯৭৯ সালে স্বদেশের মাটিতে এজবাসটন মাঠে শিল্প সুষমা ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

ডেভিড গাওয়ার শুধু বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানই নন, ক্রিকেটের এক নিপুণ জাত শিল্পী। ক্রিকেট বোদ্ধাদের মতে এখন বিশ্বের সেরা চিত্তাকর্ষক বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান, ঘুমপাড়ানী ক্রিকেটে যাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই. বোলারদের আস্ফালনে যাঁর মাথা নোয়ানো স্বভাব নয়, যিনি রেকর্ড বই এর দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যাট করেন না এবং যিনি এমন ভাবে খেলতে চান যা মাঠ ভর্তি দর্শকদের চিত্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে। সেই নাম ডেভিড ইভন গাওয়ার। ইতিমধ্যে তাঁর ক্রিকেট সংগ্রহ শালায় শতরানের ইনিংস ৯টি পঞ্চাশের মার ২৩টি।

গাওয়ার '৮৪-র ইংলিশ মরশুমে কাউন্টি ক্রিকেটে নিজের দল লিস্টারশায়ারের হয়ে রান পেয়েছেন ৯৯৯, গড় ৩৫'৬৭ রান। তিনি মাঝে মধ্যে দলের প্রয়োজনে অফ ব্রেক বল করেন। ১৯৮১-'৮২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে কানপুরে ৬ষ্ঠ টেষ্টে তিনি এই উইকেটটি পেয়েছিলেন এক রানের বিনিময়ে।

ডেভিড গাওয়ার তাঁর নিপুণ হাতে

স্কোয়ার কাট, ফ্লিক বা ড্রাইভ মারতে সিদ্ধহস্ত। কভার ফিল্ডার হিসাবে তাঁর সুনাম আছে।

১৯৮২ সালে ইংলণ্ডের অভিজ্ঞ অধিনায়ক অসুস্থ বব উইলিসের পরিবর্তে ইংলণ্ডের নেতৃত্ব করার প্রথম দায়িত্ব পেয়ে লর্ডস টেস্টে পাকিস্তানের কাছে হেরে যান দশ উইকেটে সেই থেকে দলের গুরু দায়িত্ব এখন গাওয়ারের কাঁধে। এ পর্যন্ত তিনি দেশের হয়ে ৯টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য গাওয়ারের সেই সঙ্গে দেশেরও এর কোনটিতে তাঁর দল জয়ের মুখ দেখেনি। হেরেছেন ছটিতে। যার মধ্যে আছে সদ্য সমাপ্ত ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট সিরিজ। স্বদেশের মাটিতে লজ্জাজনক ভাবে গাওয়ারের দল রবার হারিয়েছেন ০—৫ টেস্টে।

'৮২ '৮২ সিরিজে ভারত গাওয়ার বোম্বাই টেস্টে করেছিলেন ৫ ও ২০, বাঙ্গালোরে ৮১ ও নট আউট ৩৭, দিল্লীতে এক ইনিংসে শূন্য, কোলকাতায় ১১ ও ৭৪ রান ( রান আউট ), মাদ্রাজে এক ইনিংসে ৬৪ এবং কানপুরে এক ইনিংসে ৮৫ রান। মোট ৬টি টেস্টে ৯টি ইনিংসে ৩৭৫ রান—গড় ৫৪·১১।

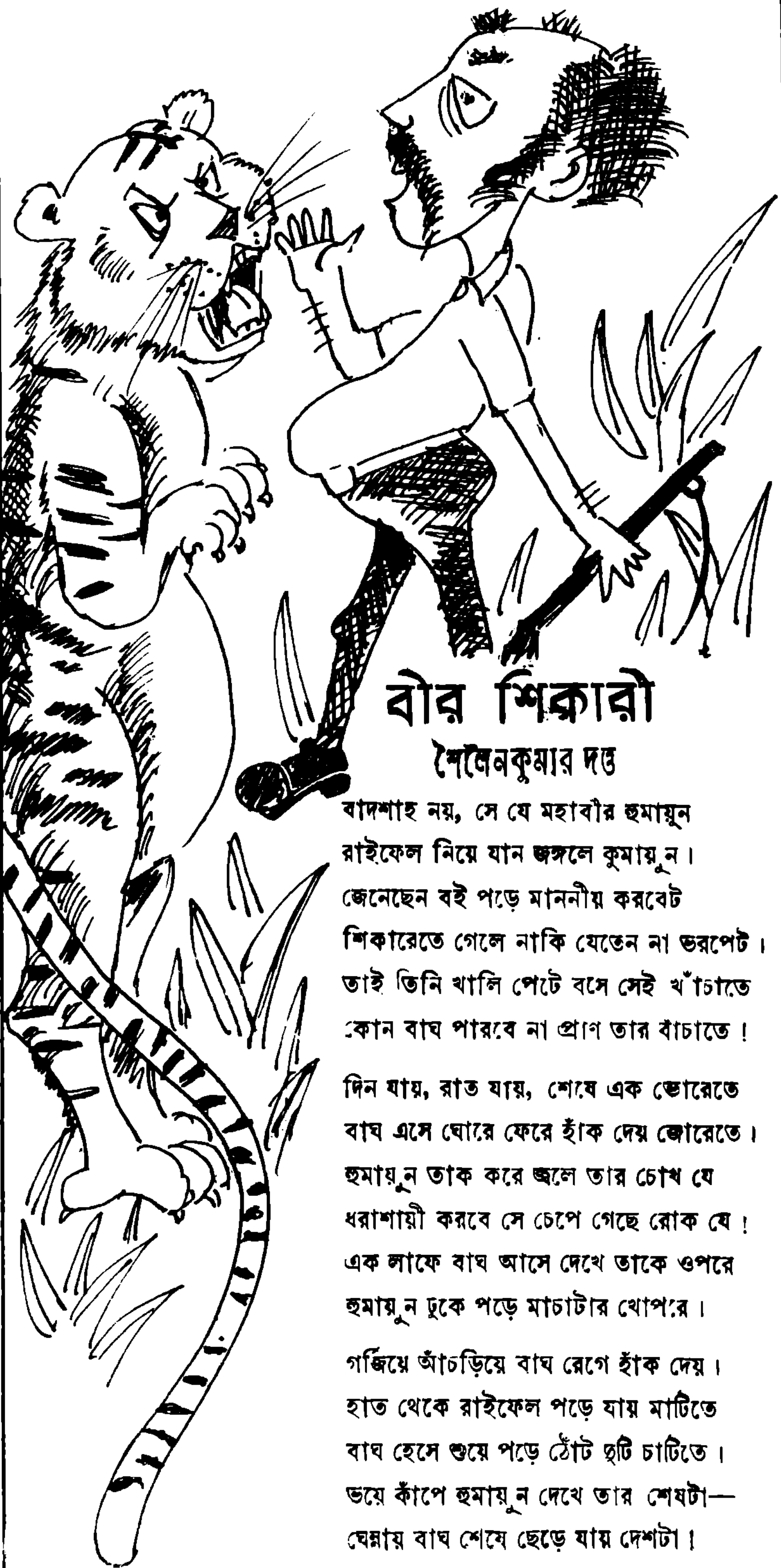

# বীর শিকারী

শৈলেনকুমার দত্ত

বাদশাহ নয়, সে যে মহাবীর হুমায়ুন
রাইফেল নিয়ে যান জঙ্গলে কুমায়ুন।
জেনেছেন বই পড়ে মাননীয় করবেট
শিকারেতে গেলে নাকি যেতেন না ভরপেট।
তাই তিনি খালি পেটে বসে সেই খাঁচাতে
কোন বাঘ পারবে না প্রাণ তার বাঁচাতে!

দিন যায়, রাত যায়, শেষে এক ভোরেতে
বাঘ এসে ঘোরে ফেরে হাঁক দেয় জোরেতে।
হুমায়ুন তাক করে জ্বলে তার চোখ যে
ধরাশায়ী করবে সে চেপে গেছে রোক যে!
এক লাফে বাঘ আসে দেখে তাকে ওপরে
হুমায়ুন ঢুকে পড়ে মাচাটার খোপরে।

গর্জিয়ে আঁচড়িয়ে বাঘ রেগে হাঁক দেয়।
হাত থেকে রাইফেল পড়ে যায় মাটিতে
বাঘ হেসে শুয়ে পড়ে ঠোঁট দুটি চাটিতে।
ভয়ে কাঁপে হুমায়ুন দেখে তার শেষটা—
ঘেন্নায় বাঘ শেষে ছেড়ে যায় দেশটা!

# বাঘের অভিজ্ঞতা

## অর্ঘ্য দাশ

বনের বাঘ বনে বেশ সুখেই ছিল। সেদিন কোথা থেকে এক মানুষ এসে নেমন্তন্ন জানিয়ে গেল। কালী পুজোর দিন হবে। অনেক করে বলে গেল মানুষটি। গণ্য মান্য গণ্য অতিথি আসবেন। কাজেই বাঘেরও যাওয়া চাই।

বাঘ বড় শান্তিপ্রিয়। ঝুট ঝামেলা একদম পছন্দ করে না। ভাবল, সেই বাবা কাকাদের আমল থেকে এই বনে আছে, পাশের গ্রামের মানুষ যখন অনেক করে বলে গেল, তখন একবার যাওয়া উচিত। আবার এও ভাবল, মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা! যা জাত এক-খানা, কখন কি ফন্দি এঁটে কাকে বেকায়দায় ফেলে কে জানে!

ভয় হয়। আবার ইচ্ছেও হয়। একবার মানুষের ঘর দোর দু-চোখ ভরে

দেখে নেয়। মধু ভাণ্ড ত আসা মানুষ সে অনেক খেয়েছে। কিন্তু তাই বলে কোন গ্রামে সে আজ পর্য্যন্ত ঢোকেনি ছোটবেলায় দাদুর কাছে গল্প শুনেছিল, দাদুর বাবা একবার মানুষের গ্রামে ঢুকে পড়ে খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছিল মানুষগুলো কি বজ্জাত। মারেনি ধরেনি। কেবল একটানা সাত দিন ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। প্রথম প্রথম দাদুর বাবা খুব তর্জন গর্জন করেছিল। তারপর না খেয়ে খেয়ে এমন মিইয়ে পড়ল যে আর সাড় ছিল না। মানুষেরা ওকে চ্যাংদোলা করে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

ভাগ্যিস সে সময় পণ্ডিত প্রবর শেয়াল মুরগী চুরি করে বাড়ী ফিরছিল। পথে দাদুর বাবাকে ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে চোখে মুখে জলের ছিটে দিল। মুরগীর রক্ত খাওয়ালো। সেদিন প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে দাদুর বাবার জ্ঞান ফিরেছিল।

সেই গল্প শোনার পর থেকে ওর আর মানুষদের প্রতি ভালোবাসা নেই। মানুষকে মনে মনে ঘেন্না করে। সেদিন বুড়ো মানুষটা যখন এসে বলে গেল "বাবা যেও, আশপাশের সব গ্রাম জঙ্গলের মাথাদের আসতে বলেছি। তুমি না গেলে আমাদের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার কথা রেখো কিন্তু।"

বাঘ রাজী হয়েছিল। সম্মতি জানিয়েছিল। তাই আজ সে চলেছে পুজো মণ্ডপে। এই জঙ্গল থেকে সে একা যাচ্ছে। বন জঙ্গল ডাইনির চুলের মতো কুচকুচে কালো। তাতে অবশ্য বাঘের কোন অসুবিধে নেই। ও দু'চোখের টর্চের সুইচ জ্বালিয়ে দিতেই দুচোখের ওপর একশো পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠলো।

প্যাণ্ডেলে পৌছতে একটু রাত হয়ে গেল সেদিনের সেই নিমন্ত্রণকারী বুড়োটা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে জোড় হাত করে বাঘকে বসতে বলল। বাঘও ভদ্রতার খাতিরে সেই সামনের পা দুটো তুলে নমস্কার জানাতে যাবে অমনি কোথা থেকে একটা ছুঁচো এসে বাঘের পেটের মধ্যে চরকির মতো একটা পাক খেয়ে সাঁ করে আবার কোথায় পালিয়ে গেল। আগুনের ফুলকি লেগে বাঘের দুচারটে লোম পুড়ে গেল। বেশ চিনচিনে জ্বালা করতে লাগল। তবু ও ভদ্রতার খাতিরে মুখে হাসি টেনে বলল, বেশ ভালোই আয়োজন করেছেন দেখছি।

গুণীজনদের জন্য সাজিয়ে রাখা চেয়ারে, বাঘ পাট করে বসল। সে ঠিক করে এসেছে মানুষের সঙ্গে একদম খারাপ ব্যবহার করবে না। আজ বাঘ জানিয়ে দিয়ে যাবে, বাঘেরাও সর্বং সহ। কিন্তু বাঘকে শান্তিতে থাকতে দিলে তো! পাড়ার ছেলে ছোকরারা চুপচাপ গোবেচারীর মতো বাঘকে বসে থাকতে দেখে ওর পাশে এসে কানের মধ্যে ফুঁ দিয়ে দেয়। বাঘের কান সুরসুরিয়ে ওঠে। তবু লাজুক হেসে ছেলে ছোকরাদের লঘু অপরাধে আস্কারা দেয়। আস্কারা পেয়ে বাঘের দু পায়ের মাঝের নরম মাংসে কচি আঙুল ঢুকিয়ে নাড়া দিয়ে পালিয়ে যায়। বাঘের কাতুকুতু লাগে। সারা শরীর সিরসিরিয়ে ওঠে। ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেলে। ছেলের দল হাঁচির আওয়াজ শুনে হুড়মুড়িয়ে পালায়, ভাবে বাঘ বুঝি রেগেছে। কিন্তু নাগাড়ে দু মিনিট হাঁচি হাঁচার পরও চুপটি করে শান্ত ছেলের মতো বাঘকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে ওরা আবার সাহস ফিরে পায়, বাঘ নির্বিকার চিত্তে কালী-মায়ের প্রতিমা দেখতে দেখতে শ্যামা সঙ্গীত শুনতে থাকে।

এদিকে ছেলে ছোকরাদের সাহস বেড়ে গেছে। ওরা বাঘের ল্যাজে ফুলঝুরি, কালীপটকা বেঁধে দেয়, এদিকে দুকানে দুটো বাচ্চা বোম বেঁধে দিলে বাঘ ভাবে নাতিরা বুঝি ঠাট্টা করে দাদুর কানে লকেট ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

বাঘ মিষ্টি হেসে আস্কারা দেয়, বলে, বুঝেছি দিদিভাইদের লকেট নিয়ে এসে আমার কানে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। দাঁড়াও এবার দিদিভাইদের বলে দিচ্ছি, তখন টের পাবে।

কিন্তু বাঘ মিষ্টি কথা বললে কি হবে! ছেলেরা যে দুষ্টু। তারা ততক্ষণে দাদুর দুকানের পলতেতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওদিকে ল্যাজে বাঁধা ফুলঝুরিও জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। কি ঘটতে যাচ্ছে বাঘ বুঝতে পারার আগেই দমাদম শব্দে দুকানের পাশের বোমা দুটো ফেটে উঠল। বাঘ ভাবে তার কানের পর্দা ফাটল। বাঘ পাগলের মতো বিকট শব্দে চিৎকার করে প্যাণ্ডেল থেকে এক লাফে দে দৌড়। ভাবল দাদুর বাবার মতো আবার ওকেও মারবার ফাঁদ পেতেছে মানুষের দল। এই মুহূর্তে এ জায়গা থেকে না সরলে প্রাণে বাঁচা যাবে না। ল্যাজে বাঁধা কালীপটকা তখনো ফেটে চলেছে।

বনের সীমানায় ফিরে গিয়ে বাঘ হাঁপাতে লাগল। মনে মনে বলল, দাদুর বাবার আমলে মানুষ যেমন ছিল, আজও তেমন আছে। ওদের সঙ্গে আমাদের কোনকালে মিলবে না। ●

# একটি অবিস্মরণীয় ইনিংস

রাজীবকুমার দাস

এই মুহূর্তে যদি প্রশ্ন করা হয়, ভারতীয় ক্রিকেট দলের সর্বশ্রেষ্ঠ বোলারটি কে? নিশ্চয়ই সকলে এক-বাক্যে স্বীকার করবে যে তিনি হলেন কপিলদেব। ঠিক তাই, কপিলদেবই হচ্ছেন ভারতীয় দলের অপরিহার্য এবং শ্রেষ্ঠ বোলার। তাঁকে ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট দলের কথা ভাবাই যায় না। ১৯৭৭-'৭৮ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামার পর এই ক'বছরেই তিনি পৌঁছে গেছেন খ্যাতির শীর্ষ-বিন্দুতে। আজ তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার। কপিলদেব নিখাঞ্জ তাই আমাদের গর্ব।

গত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার আসরে কপিলদেব ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। এই প্রতিযোগিতায় তিনি অপরাজিত ১৭৫ রানের দীর্ঘ একটি অনবদ্য অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলেছিলেন এবং তৎপরবর্তী প্রায় এক বছর ঐ ১৭৫ রানই ছিলো একদিনের সীমিত ওভারের কোন ম্যাচে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। আশা করি সেই ম্যাচের কথা এখনও মনে আছে। গত বছর ৩১শে মে ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভিভ রিচার্ডস কিন্তু ১৮৯ রান করে এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচে কপিলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের নজিরটি ভেঙে দিয়েছেন। ভিভ অনবদ্য খেলে নতুন নজির তৈরী করেছেন ঠিকই কিন্তু তা সত্ত্বেও কপিলের ঐ কৃতিত্ব কোনদিনও ভোলার নয়। কেননা কপিল যে সংকটময় মুহূর্তে ব্যাট করতে আসেন এবং যে ধরনের রোমাঞ্চকর খেলা খেলে জয় ছিনিয়ে নেন তা কোন দিনই বিস্মৃত হবার নয়। কপিলের সেই কৃতিত্বের স্মরণীয় মুহূর্তই আজ লিখছি।

আঠারোই জুন উনিশশো তিরাশি। টানব্রিজ ওয়েলসের মাঠে প্রুডেনসিয়াল বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জিম্বাবুয়ে বনাম ভারতের খেলা। জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক ডানকান ফ্লেচারের বল সীমানার বাইরে পাঠিয়েই ইতিহাস তৈরী করলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার কপিলদেব নিখাঞ্জ। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে এক অবিস্মরণীয় ইনিংস খেলে কপিল-দেব ১৭৫ রানে অপরাজিত থেকে প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডের অধিকারী হলেন। তিনি নিউজী-ল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান গ্লেন টার্নারের কাছ থেকে এই রেকর্ডটি ছিনিয়ে নিলেন। এর আগে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটি ছিলো গ্লেন টার্নারের অপরাজিত ১৭১ রান। টার্নার ১৯৭৫ সালে পূর্ব-আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঐ রেকর্ড করেছিলেন।

জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে ভারত এক সময়ে ১৩ ওভারে মাত্র ১৭ রানে ৫টি উইকেট হারিয়ে নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। এই সময় সকলেই ধরে নিয়েছিলো যে ভারত

বুঝি শতকের ঘরেও পৌঁছতে পারবে না, এমন কি ভারত সবচেয়ে কম রানের ইনিংস করে বিশ্বকাপের ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করবে এরকমও ভাবা হয়েছিলো। যদিও এরকম ভাবাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। কেননা গাভাসকার, মহীন্দর অমরনাথ পাতিল শ্রীকান্ত, যশপাল শর্মার মতো নির্ভর-যোগ্য ব্যাটসম্যানেরা ইতিমধ্যেই প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছেন। এরকম এক ভয়ঙ্কর দলীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও অমিত পরাক্রমশালী নায়কের মতো ক্রীজে দাঁড়িয়ে থেকে মাত্র ১৩৮ টি বল খেলে ১৭টি বাউণ্ডারী ও ৬টি ওভার-বাউণ্ডারী হাঁকিয়ে ১৭৫ রানে অপরাজিত থেকে গেলেন এবং সেই সঙ্গে নির্ধারিত ৬০ ওভারে ভারতীয় দলের রানকে নিয়ে গেলেন এক সম্মান-জনক অবস্থায়, ৮ উইকেটে ২৬৬ রানে। এক কথায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন কপিলদেব। জিম্বাবুয়ের সঙ্গে এই ম্যাচে ভারতের প্রথম উইকেট (গাভাসকার) পড়েছিলো রানে, দ্বিতীয় উইকেট (মহীন্দর) ৬ রানে, তৃতীয় উইকেট (শ্রীকান্ত) ৬ রানে, চতুর্থ উইকেট (পাতিল) ৯ রানে এবং পঞ্চম উইকেট (যশপাল) পড়েছিলো মাত্র ১৭ রানে। সুতরাং সেই মুহূর্তে ভারতের দলীয় অবস্থা যে কি ছিলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। ত্রয়োদশ ওভারে যশপাল যখন আউট হয়ে গেলেন তখন ব্যাট করতে মাঠে নামলেন কপিলদেব। এসেই বিন্নির সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করে রান যোগ করলেন। দলীয় রান যখন ৭৭ তখন স্ট্রাইকসের বলে এল বি হলেন রজার বিন্নি। ব্যাট করতে আসলেন রবি শাস্ত্রী। মাত্র এক রান যোগ করেই পাইক্রফটের হাতে ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন শাস্ত্রী। ভারতের রান তখন ৭৮, ৬ উইকেটে। এই সময় মদনলাল এলেন অষ্টম উইকেটে কপিলের সাথে জুটি বাঁধতে। তারা দুজনে অষ্টম উইকেটে ৬২ রান তুললেন। ১৪০ রানের মাথায় মদনলাল কুরানের বলে হটনের কাছে ক্যাচ দিয়ে আউট হলেন। একপ্রান্তে শুধু যাওয়া আর আসা চলছে কিন্তু অপরপ্রান্তে কপিল অবিচল নির্বিকার। এবার আসলেন কিরমানী। তিনি এসেই খেলার মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দিলেন। কিরি অত্যন্ত সংযমের পরিচয় দিয়ে কপিলকে খেলতে সাহায্য করলেন। কপিলের ব্যাটে তখন রানের টাইফুন চলছে—হাত খুলে মারতে শুরু করেছেন। কিন্তু ৬০ ওভার শেষ হতে আর বাকী নেই। শেষ পর্যন্ত কিরমাণী আর কপিল দু'জনেই নট আউট থেকে অসমাপ্ত নবম উইকেটে ১২৬ রান যোগ করে ভারতীয় দলের রানকে টেনে নিয়ে গেলেন ২৬ -তে. তবে সেই সময় নির্ধারিত ৬০ ওভার শেষ না হয়ে গেলে হয়তো কপিলদেবের অপরাজিত দুই শত রানও আমরা দেখতে পেতাম। কিন্তু তা আর হলো না—এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তবে যাই হোক, কপিলদেবের ও ধরনের অনন্য অসাধারণ দুর্ধর্ষ ইনিংস যে কখনোই বিস্মৃত হবে না তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আর সে কারণেই তোমাদের জন্য 'স্মরণীয় খেলা' বিভাগের লেখা তৈরী করার সময়ও বার বার এই ইনিংসটির কথাই আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

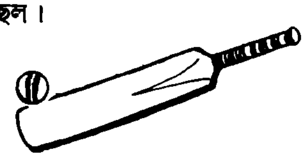

# স্পোর্টস ক্যুইজ

১ ফুটবলে ১৯৮১ সালে অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন কোন খেলোয়াড়?

২। মুক্তার ডাহরী কোন দেশের খেলোয়াড়?

৩। ১৯৮৪ ৮৫ মরশুমে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের কোন ক্রিকেটার টেষ্ট অভিষেকে সেঞ্চুরী করেন?

৪। গ্লীন টার্নার কোন দেশের ক্রিকেটার?

৫। হকির যাদুকর কে?

৬। পাকিস্থানের একজন হকি খেলোয়াড়ের নাম কি?

৭। নবম এশিয়াডে কোন মহিলা খেলোয়াড় টেনিসে স্বর্ণপদক লাভ করেন?

৮। আমেরিকার একজন বিখ্যাত মহিলা টেনিস খেলোয়াড়ের নাম কি

৯। ১৯৮১ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান দাবাড়ু কে?

১০। বাংলার খুদে দাবাড়ু কে?

১১। নবম এশিয়াডে কোন চীনা খেলোয়াড় ব্যাডমিন্টনে সোনা জয়লাভ করে?

উত্তর

১। সুধীর কর্মকার
২। মালয়েশিয়া
৩। আজাহারউদ্দিন
৪। নিউজিল্যাণ্ডের
৫। ধ্যানচাঁদ
৬। আখতার রসুল
৭। জাপানের এট্সুকো ইনোয়ু
৮। ম্যাট্রিনা নাভ্রাতিলোভা
৯। আনাতোলি কারপোভ্
১০। দিব্যেন্দু বড়ুয়া
১১। হং জিয়াং

গীতানন্দ কর্মকার

# শুরুতেই সেঞ্চুরী

হান্নান আহসান

টেস্টে নেমেই সেঞ্চুরী মানে এগারো জনের মধ্যে নিজেকে নড়িয়ে চড়িয়ে বসিয়ে নেওয়া। শুধু ক্রিকেট কেন, সকল খেলার ক্ষেত্রেও তাই। শুরুতেই নজরে ধরাতে পারলেই ভাগ্যটা ঘুরে বসে। আর নিজের চলার পথটা রাতারাতি পরিবর্তন ক'রে নেওয়া যায় বোধ হয়।

দেখা যাক শুরুতেই কার ভাগ্যের চেহারাটা কেমন ভাবে বদলেছে টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায়। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে এ পর্যন্ত শুরুতেই সেঞ্চুরী হাঁকিয়েছেন ৮ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে লালা অমরনাথ এবং গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ক্রিকেটে নিজেদের নাম প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। যদিও অমরনাথ ২৪টি টেস্ট খেলে আবির্ভাব লগ্নের সেঞ্চুরী ছাড়া কোন সেঞ্চুরী পাননি। আর নবাগত, কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় আজাহারউদ্দিনের সবে তো শুরু। ভারতীয় ক্রিকেটে কিংবা বিশ্ব ক্রিকেটের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হওয়ার জন্য শুরু হয়েছে তার পথ পরিক্রমা।

১৯৩৩-৩৪ সালে ইংল্যাণ্ড দল সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে সরকারীভাবে টেস্ট খেলতে আসে। বোম্বাই জীবনের প্রথম টেস্টে লালা অমরনাথ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন ১১৮ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলে। সেঞ্চুরী পেলে হবে কি! অমরনাথের মন সেদিন দুঃখে ভরে উঠেছিল, কারণ ভারতকে ৯ উইকেটে হার স্বীকার করতে হয়েছিল ঐ টেস্টে। তবুও এই সম্মান অন্য কোন ভারতীয়দের কপালে এর আগে জোটেনি। ডি এইচ সোধন ১৯৫২-৫৩ মরশুমে সফররত পাকিস্থানের বিরুদ্ধে কলকাতার পঞ্চম টেষ্টের প্রথম ইনিংসে ১১০ রানের একটি অদ্ভুত ভালো সেঞ্চুরী উপহার দিয়েছিলেন দর্শকদের। অবশ্য শুরুতেই সাড়া জাগিয়ে দিলেও সোধনকে সারা জীবনে ৩টি টেস্ট খেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। হায়দারাবাদে প্রথম টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬ সালে এ জি কৃপাল সিং ১০০ রান করেন। ১৯৫৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্টে এ এ বেগ দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রান করেও দলের হার এড়াতে পারেননি। হনুমান্ত সিং ১৯৬৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দিল্লীর চতুর্থ টেস্টে

সুরিন্দার অমরনাথ

আজাহারউদ্দিন

বিশ্বনাথ

গ্রেগ চ্যাপেল,

ডব্লিউ জি গ্রেস,

রঞ্জিত সিংজী

১০৫ রানের ইনিংস গড়ে ৫নং ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে নিজের নাম খোদাই করেছিলেন আবির্ভাব লগ্নে সেঞ্চুরী করে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ জীবনের প্রথম টেষ্টের প্রথম ইনিংসে শূন্যতে আউট হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৭ রান করে প্রমাণ করেছিলেন তাঁর ভবিষ্যত উজ্জ্বল। ১৯৭৫-৭৬ মরশুমে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অকল্যাণ্ডের প্রথম টেস্টে সুরিন্দার অমরনাথ ১২৪ রান করেন। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি বিদেশের মাটিতে আবির্ভাব লগ্নে সেঞ্চুরী পেয়েছেন! এরপর অষ্টম ক্রিকেটার হিসেবে মহম্মদ আজাহারউদ্দিন শুরুতেই সেঞ্চুরী উপহার দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত শেষ নামটি লিখিয়েছেন চলতি সিরিজে (১৯৮৪-৮৫) ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতার তৃতীয় টেস্টে ১১০ রানের একটি রাজকীয় ইনিংস খেলে।

এতক্ষণ কেবল ভারতের কথাই বলে গেলাম। এখন দেখা যাক, অন্যান্য দেশের কোন কোন ক্রিকেটার টেস্ট আবির্ভাবেই সাড়া জাগিয়েছেন।

ভারতের আজাহারউদ্দিনকে নিয়ে অভিষেক টেস্টে শতরান পেয়েছেন বিশ্বে মোটমাট ৫১ জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রিকেটার টেষ্ট-অভিষেকে শতরান পেয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই অমূল্য সম্মান লাভ করেছেন ১৪ জন খেলোয়াড়। ইংল্যাণ্ডের ১৩ জন, ওয়েষ্টইণ্ডিজের ১০ জন এবং পাকিস্থান ও নিউজিল্যাণ্ডের ৩ জন করে খেলোয়াড় এই অনন্য রেকর্ডের অধিকারী।

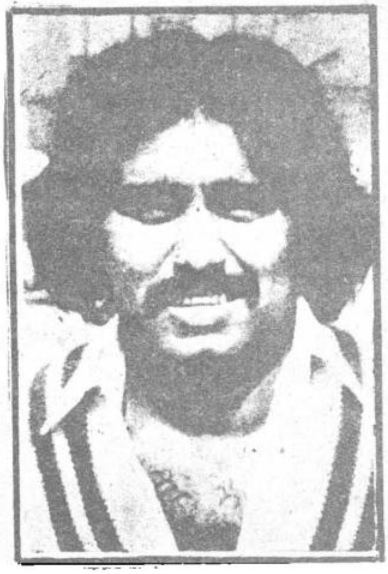

মিঁয়াদাদ

টেষ্ট অভিষেকে সেঞ্চুরী করে পরবর্তীকালে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছেন বা করছেন এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা মন্দ নয়। এই মুহূর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি পরিচিত নাম। তাঁরা হলেন —বিল পন্সফোর্ড, গ্রেগ চ্যাপেল, ডব্লিউ জি গ্রেস, রঞ্জিত সিংজী এস গ্রিফিথ, কালিচরণ, গর্ডন গ্রীনিজ, জাভেদ মিঁয়াদাদ ও সেলিম মালিক।

গাভাসকার ও মিঁয়াদাদ

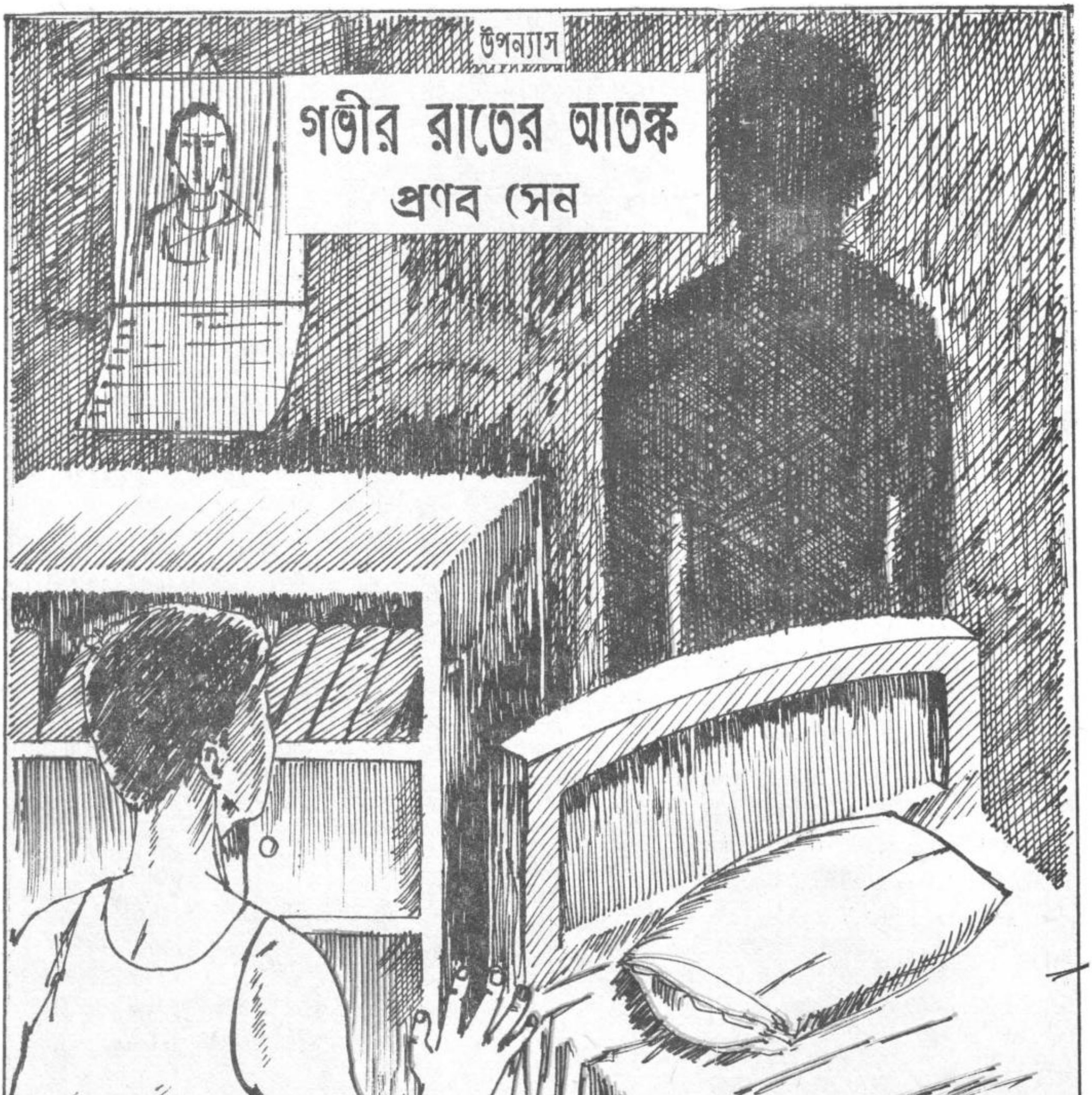
উপন্যাস
গভীর রাতের আতঙ্ক
প্রণব সেন

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে ত্রিদিববাবু বাড়ীর ছাদে পায়চারি করতে ভালবাসেন। ছাদের দুদিকে নানারকমের ফুলের গাছ লাগিয়েছেন মাটির টবে. বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, ত্রিদিববাবুর মন আনন্দে ভরে ওঠে, গাছ-গুলিতে জল দিয়ে তবে ঘরে ফিরে আসেন।

প্রতিদিনের মতো আজও গিয়েছেন ছাদে। তাঁর প্রিয় গাছের কয়েকটা টব কারা ভেঙে রেখে গেছে। গাছগুলি ছিঁড়ে নষ্ট করে সারা ছাদে ছড়িয়েছে। কারা এসেছিল বুঝতে পারছেন না, আর নিরীহ গাছগুলির ওপর তাদের আক্রোশই বা কেন!

হঠাৎ নজর গেল ঘরের দিকে, দরজা হাট করে খোলা। তবে কি ত্রিলোচন ঘুম থেকে উঠে গেছে? ঘরের মধ্যে ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ! বিছানা শূন্য, কোথায় গেল ত্রিলোচন? ঘরের চারদিক খুঁজেও তার কোন হদিশ পেলেন না। অবশেষে খাটের নীচে উঁকি মেরে দেখলেন, ত্রিলোচন শুয়ে আছে, সারা শরীর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, মুখ বালিশের ঢাকনা দিয়ে জড়ানো যাতে চিৎকার করতে না পারে। ত্রিদিববাবু বেশ কয়েকবার নাম ধরে ডেকেও কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। উনি হামাগুড়ি দিয়ে ত্রিলোচনের কাছে গেলেন, ত্রিলোচন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

তিনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর চেঁচা-মেচিতে সকলের ঘুম ভেঙে সারা বাড়ীতে হৈ চৈ বেধে গেছে। ত্রিদিববাবুর বড় ছেলে বিকাশ এক বালতি জল নিয়ে গেল। ত্রিলোচনের মুখের বাধন খুলে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেবার পর চোখ মেলে তাকালো। কিন্তু এখানে শুয়ে আছে কেন বুঝতে পারলো না। সবাই চলে এসেছে ঘরে, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। নড়াচড়া করার চেষ্টা করলো, কিন্তু দড়ি অত্যন্ত মোটা, তাকে ছিঁড়ে ফেলা সহজ নয়। ত্রিলোচন চিৎকার করে উঠল, তোমরা আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছ কেন?

বিকাশ বললো. আমরা বেঁধেছি না কি? আমরা ঘরে ঢুকে তোমাকে এই অবস্থায় এখানে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

দড়ি খুলে দাও তাড়াতাড়ি, আমার খুব ব্যথা লাগছে!

বিকাশ ত্রিলোচনকে ঠেলতে ঠেলতে খাটের তলা থেকে বের করে নিয়ে এল। দড়ি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলো তোমার ঘরে কারা এসেছিল তুমি জানো না?

না, চোখ খুলে আমি তোমাদেরকেই প্রথম দেখতে পাই।

আমরা কেন তোমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধবো বলো?

ত্রিদিববাবু অনুসন্ধান করে দেখছেন ঘর থেকে কি কি খোয়া গেছে। এই ঘরে অবশ্য তেমন কোন মূল্যবান জিনিষ থাকে না যা নি[illegible] যেতে পারলে চোরেদের কোন উপকারে লাগ[illegible] দেয়াল আলমারির একটা কাঁচ অনেকদিন [illegible] আছে, সেখান দিয়ে হাত গলিয়ে হয়তো কিছু নিতে পারে। কিন্তু না, সব জিনিস একই ভাবে আছে। ত্রিদিববাবু নিজের মনে হেসে উঠলেন, বেচারী, এত পরিশ্রম করে পাইপ বেয়ে উপরে এল কিছুই পেল না। শেষপর্যন্ত শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই চোরগুলো ঘরে ঢুকলো কি করে! তবে কি ত্রিলোচন দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল? দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে গেলে ওর নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে যেত। তাছাড়া দরজা ভাঙার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ত্রিলোচনকে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করতে উঠে বসেছে। নিজেই মনে করার চেষ্টা করছে কারা এসেছিল ঘরে। ত্রিদিববাবু জিজ্ঞেস করলেম, তুমি কি রাত্রিবেলায় দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

না, আমি নিজের হাতে দরজা বন্ধ করেছি, ওপরের ও নীচের ছিটকিনি ঠিকমতো আটকে টেনে দেখেছি দরজা খোলে কি না।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা থাকলে বাইরে থেকে কেউ কি দরজা না ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারে ত্রিলোচন? আমার ধারণা দরজা খোলাই ছিল তাই তারা অনায়াসে ঘরে ঢুকতে পেরেছে।

ত্রিলোচন চোখ কাচুমাচু করে বললো, আমি ভুল বলছি না।

এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ওরা ঘরে ঢুকে তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো, কোন চিৎকার অথবা ধস্তাধস্তির শব্দ আমরা শুনতে পাই নি এমন শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্ত ঘটনা কি ভাবে ঘটলো?

ত্রিলোচন এমন প্রশ্নে ঘাবড়ে গেছে, এতসব ঘটে গেছে অথচ নিজে কিছু টের পায় নি। কিভাবে ঘটলো এখন কিছুই মনে করতে পারছে না. উপস্থিত সকলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, এই ঘরে একা না শুলেই ভাল হতো। এই ঘরে নিশ্চয়ই এমন কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কেউ জানে

না।

ত্রিদিববাবু বললেন, তুমি চুপ করে থাকলে আমরা কিছুই জানতে পারব না, অথচ আমাদের জানতেই হবে, তুমি বুঝতেই পারছ সকলেই তোমার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ত্রিলোচন কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না, আরো ভ্যাবাচ্যাবা খেয়ে গেছে। গত রাতে কি ঘটেছিল তাভাবার চেষ্টা করছিল একমনে, ত্রিদিববাবুর কথায় সে হঠাৎ থমকে গেল, এখন আর কিছুই মনে আসছে না, এমন বিপদে পড়বে ও কথা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারে নি, কোনমতে এ বাড়ী থেকে বেরোতে পারলেই বেঁচে যায়, ভুল করেও আর কখনও এ বাড়ীর মুখো হবে না।

ত্রিলোচনের চোখমুখের অবস্থা দেখে বিকাশ বললো, ওকে আর বিরক্ত করো না, বেচারী খুব ঘাবড়ে গেছে। ওকে আমরা সারাদিন সময় দিলাম কাল রাতে কি ঘটেছিল মনে করতে, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমরা সব শুনবো।

ত্রিলোচন এক মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে যত সহজে রেহাই পাবার কথা ভাবে ততই আটকে রাখতে চায় সকলে।

( ২ )

দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে ত্রিলোচন ঘরে ফিরে এসেছে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে। চোখের পাতা দুটো যেন ভারী হয়ে উঠেছে, ঘুম আসছে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা মারছে। কেউ নিশ্চয়ই ঘরে আসতে চায়। ত্রিলোচন বিরক্ত হয়ে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে কেউ নেই। সামনে ছাদ একেবারে ফাঁকা, শুধু দমকা বাতাস খোলা দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

তবে হয়তো ভুল শুনেছে, অথবা বাতাসের জন্যই দরজায় শব্দ হচ্ছিল। ত্রিলোচন শুয়ে আছে একটু তন্দ্রা এসেছে. কেউ যেন পাশে এসে শুয়েছে মনে হলো। চিৎকার করে উঠলো, কে কে ?

উত্তর দেবে কে, কেউ তো নেই। নিজের চিৎকার ঘরের নির্জনতাকে ভেঙেচুরে খানখান করে দিল। সমস্ত ঘরটা গমগম করে উঠেছে, শরীরের সব লোমকূপ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা আতঙ্ক এসে মন জুড়ে বসেছে।

ত্রিলোচন কি ঘর থেকে চলে যাবে ? না চলে গেলে সকলেই ঠাট্টা করতে পারে। দিনের বেলায় ভয় পাবার কথা নয়, তবু মাঝে মাঝে গা ছমছম করে উঠছে। ত্রিলোচন মনে সাহস সঞ্চয় করে বললো এ ঘরেই থাকবো, দেখি না শেষ পর্যন্ত কি হয়।

হাসির শব্দ কানে বেজে উঠলো, কে যেন বিদ্রুপ করতে চায়। নাকি সুরে বাতাসে ফিস-ফিস করে কেউ বলছে, অনেক সাহসী লোক আমি দেখেছি কেউ পারেনি এখানে থাকতে, সবাই বাধ্য হয়ে দৌড়ে পালিয়েছে।

ত্রিলোচন বললো ? আড়ালে না থেকে সামনে এসে দাঁড়াও।

চোখের সামনে দেয়াল আলমারির কবাট দুটো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে দুলতে লাগল। এ কি করে সম্ভব ? ছিটকিনি লাগানো ছিল, মানুষ ছাড়া আর কারো পক্ষে ছিটকিনি খোলা সম্ভব নয়। ত্রিলোচনের চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেছে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

কি চলে যেতে চাইছ কেন ? খুব সাহস দেখিয়ে তো বলেছিলে শেষপর্যন্ত কি হয় দেখে তারপর যাবে।

ত্রিলোচন কোন উত্তর না দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ছিটকিনি এত শক্ত হয়ে এঁটে গেল কিভাবে ? শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করেও এতটুকু নড়াতে পারলো না।

আবার সেই রহস্যময় হাসি, ত্রিলোচনের শরীরের সব রক্ত হিম হয়ে গেছে। মেঝেতে পড়ে যাবার মুখে এক হাতে য়াল ধরে ফেলেছে। সেই কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেল, ভয় নেই, আমি এখন তোমার কোন ক্ষতি করবো না, তুমি এখানে থাকো. তোমাকে আমি যেতে দিতে চাই না, তাই দরজা তুমি খুলতে পারো নি।

তুমি কি করতে চাও আমাকে নিয়ে ?

কিছু না, তুমি খুব ভালো মানুষ, তাই তোমার সঙ্গে গল্প করে আমি আনন্দ পেতে চাই।

তুমি কি করে জানলে আমি ভালো মানুষ ?

আমি সব বুঝতে পারি। তুমি এখন যা মনে মনে ভাবছ তাও আমি বুঝতে পারছি।

আমি কি ভাবছি বলো তো ?

তুমি আর এখানে থাকতে চাও না, সুযোগ পেলেই এ বাড়ী ছেড়ে পালাবে

ধারাবাহিক

বই পড়তে বোধ হয় সবাই ভালোবাসো। আর ভালো বই পেলে তো কথাই নেই। আমরা কেবল সেই সব ভালো আর টাটকা বই নিয়ে হাজির হবো এই বিভাগে। বইয়ের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দেবো তোমাদের। যাতে বইটি কেনবার আগে স্বচ্ছ একটা ধারণা গড়ে ওঠে সবার মধ্যে।

# টাটকা বই

চৈতালী ঘোষ

**মবিডিক : হারম্যান্ মেলভিন**
**প্রকাশক : শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ**
**মূল্য : তিন টাকা।**

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে হারম্যান্ মেলভিনের জন্ম। সমুদ্রকে ভালবেসে, সমুদ্রের টানে মেলভিন জাহাজে কেবিন বয়ের চাকরী নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে। অবশেষে ১৮৪১ খ্রীঃ আজন্ম নির্ভীক মেলভিন ভাগ্যক্রমে এক তিমি শিকারীর জাহাজের সন্ধান পেয়ে গেলেন নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশায়। যেতে যেতে দেখলেন নানান মানুষ। বিভিন্ন তাদের সাজসজ্জা, বিভিন্ন রুচি আর নানান উদ্দেশ্য। এইভাবে একান্ত সঙ্গী হলেন ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন আহাবের। ক্যাপ্টেন আহাবের চির শত্রু ছিল এক ভয়াবহ, বিশালাকৃতির তিমি। নাম তার মবিডিক। সেই তেজী তিমিকে শিকার করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মেলভিন। তারপর শুরু হল যুদ্ধ। তিমির সঙ্গে মানুষে। মেলভিনের নিজের হাতে লেখা সেইসব রোমহর্ষক ঘটনাকে নানা রঙে সাজিয়ে, একটি সচিত্র বিদেশী কমিকস্ তোমাদের জন্য উপহার দিয়েছেন শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ। বিশ্ব সাহিত্য চিত্রকথার আর একটি গল্প। আলেকস্ নিনোর চিত্রন, অনিল কর্মকারের অনুবাদ তোমাদের সকলের ভাল লাগবে। আর পছন্দ হবে গোতম কর্মকারের চিত্রবিন্যাস ও বর্ণযোজনা।

**আগ্নেয়গিরির গুপ্তধন : কমাণ্ডো প্রোডাকসন্স্**
**প্রকাশক : রঞ্জন প্রকাশন**
**মূল্য : তিন টাকা**

রোনাল্ডে প্রোডাকসন্স-এর চিত্রকাহিনীকে বাংলায় রূপান্তর ক'রে গুপ্তধন নিয়ে একটি রোমাঞ্চকর কমিকস্ প্রকাশ করেছেন রঞ্জন প্রকাশন। ঘুমন্ত একটি আগ্নেয়গিরির এক কোনে এক বিশাল স্বর্ণ ভাণ্ডার লুকোন ছিল ষোড়শ শতাব্দী থেকে। তারপর বিংশ শতাব্দীতে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন দক্ষিণ আমেরিকার ঐ স্থানে হানা দিল। এক জার্মান ক্রুজার। একের পর এক বিটিশ বাণিজ্য জাহাজগুলো ধ্বংস করে দিল সেই ক্রুজারটি। এরপর দু'জন ব্রিটিশ নাবিক আর একজন আমেরিকান ভাগ্যান্বেষীর অভিযান শুরু হল। ব্রিটিশদের লক্ষ্য ক্রুজার আর আমেরিকানদের লক্ষ্য গুপ্তধন। এই নিয়ে এক দুর্দ্ধর্ষ, বিপজ্জনক অভিযান। সুষ্ঠু চিত্রসজ্জা ও স্বচ্ছন্দ বর্ণ সুষমা গোতম কর্মকারের, সুধু তাই নয় চোখ ধাঁধানো রঙে আঁকা প্রচ্ছদ শিল্পীও তিনি। অনিল কর্মকারের বর্ণ লিপিও ভাল হয়েছে।

**ছোটদের চার্লি চ্যাপলিন**
**প্রকাশক : গীতাঞ্জলী প্রকাশনী**
**লেখক : অচিন চৌধুরী।**
**মূল্য : বারো টাকা।**

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান চার্লি চ্যাপলিন সম্বন্ধে তোমাদের বোধহয় অপার জিজ্ঞাসা। কোন দেশের লোক এই চার্লি? কেমনই বা ছিল তাঁর জীবনধারা? এইসব নানা প্রশ্ন, নানা কৌতূহলের সমাধান ঠিক তোমাদেরর মনের দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন লেখক অচিন চৌধুরী। হাসির রাজা চার্লি চ্যাপলিন প্রকৃতপক্ষে নিজের জীবনে কতখানি হেসেছেন আর কতখানি হাসিয়েছেন তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করতে পারবে তাঁর জীবনী পড়ে। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, নিখুঁত বাঁধাই ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে একশ' চুয়াল্লিশ পাতার বই। ভাষামাধুর্য্যে লেখকের মুন্সিয়ানা আগাগোড়া প্রকাশ পেয়েছে। তোমাদের জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন জয় করবে। চলচ্চিত্র জগতের উন্মেষকালে যাত্রা শুরু করেছিলেন চার্লি, এরপর কত বহু কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম ক'রে সম্মানের পর্ব্বত শীর্ষে উঠেছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আশা রাখি এই বই সমগ্র পাঠক মহলে বিশেষ অনুদৃত হয়ে উঠবে।

**মারাঠা সূর্য শিবাজী**
**রিণ্টু চট্টোপাধ্যায়**
**গীতাঞ্জলী কাশনী।**
**মূল্য : সাত টাকা মাত্র।**

শিবাজীকে নিয়ে অনেক গল্প তোমাদের পড়া আছে। ছলে, বলে, কৌশলে চতুর শিবাজী কিভাবে তাঁর জীবনযাপনের একের পর এক বাঁধা অতিক্রম করেছেন তারই সব গল্প। তিনশ বছর আগের পটভূমি। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা নয় লেখক রিণ্টু চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসের গল্পে রঙ মিশিয়ে, মজা দিয়ে পাঠকের মন ভরিয়েছেন। সবই শিবাজীকে নিয়ে লেখা, নজরবন্দী কে এই সন্ন্যাসী, দূর্গ কোণ্ডানা, মামাজী আওরঙ্গজেব সূর্যের চোখে জল এরকম অনেক চমকদার গল্পের রোমাঞ্চকর ও ট্র্যাজিক পরিস্থিতি পাঠকের মন ভরাবে। এছাড়া আছে নিখুঁত বাঁধাই পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ আর ইন্দ্র দুগারের আঁকা প্রচ্ছদে শিবাজীর একটি বীরোচিত ছবি।

# যেমন খুশি বন্ধু কর

রনদীপ বসু
তৃতীয় শ্রেণী ( সাউথ পয়েন্ট ) বয়স—৮
হরিনাভী, চব্বিশ পরগণা
সখ—গাড়ী চড়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখা

সাহা আলম্ শেখ
সপ্তম শ্রেণী বয়স - ১১
প্রযত্নে, মতি ষ্টোর্স ( মাষ্টার )
কাছারিবাজার
বারুইপুর ( ২৪ পরগণা )
সখ - খেলা

চৈতালী বসু ( ৮ )
প্রযত্নে—দীপক বসু
দ্বিতীয় শ্রেণী
হরিনাভী, ২৪ পরগণা
শখ : পড়া ও খেলা

মানব কুমার দাশ
দশম শ্রেণী
দক্ষিণ নারায়ণপুর, কাঁকিনাড়া
সখ—ডিটেক্টিভ বই পড়া, দাবাখেলা

রূপক বসু ( ১০ )
প্রযত্নে—দীপক বসু
৬ষ্ঠ শ্রেণী
হরিনাভী, ২৪ পরগনা
শখ : বই পড়া/ক্রিকেট খেলা/ফুটবল খেলা

সেখ্ হুমায়ুন
ছাত্র বয়স - ১৮
রঘুদেব বাটি ( হাওড়া )
সখ পত্রিকা পড়া, অভিনয় করা।

তনুজা রায়
দ্বাদশ শ্রেণী, বয়স—১৭
প্রযত্নে, শ্রীকান্তিভূষণ রায়
পোঃ+গ্রাম—আরবালিয়া
জেলা—২৪ পরগণা
সখ—কবিতা পড়া গান শেখা

শুভব্রত বসু
সপ্তম শ্রেণী বয়স - ১২
হরিনাভী, চব্বিশ পরগণা
সখ - ক্রিকেট খেলা ও আবৃত্তি

জয়ীতা বসু
নবম শ্রেণী বয়স - ১৫
হরিনাভী ( চক্রবর্তী পাড়া ) ২৪ পরগণা
সখ - নাটক গান শোনা ও ভ্রমণ

কুপন

নীচের কুপনটি পূরণ করে পাঠাতে হবে।

নাম........................................................

বয়স.................... শ্রেণী ....................

ঠিকানা ....................................................

...............................................................

# এলবা ক্লিনিং পাউডার

দাম কম
ঝকঝকে
ঝলমলে

এলবা লেবোরেটরিজ
কলিকাতা - ৭০০০৭৩

এলবা
ক্লিনিং
পাউডার
NEW SUPER
ELBA
multipurpose
CLEANING
POWDER
দাম কম
ঝকঝকে
ঝলমলে
EL এলবা লেবোরেটরিজ
কলিকাতা - ৭০০০৭৩